আল্লাহর
ভালোবাসায়
সিক্ত
যারা
খুররম জাহ্ মুরাদ
অনুবাদঃ আলী আহমাদ মাবরুর

খুররম জাহ্ মুরাদ (১৯৩২-১৯৯৬)

একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক। এশিয়ার একজন বিখ্যাত প্রকৌশলী। একই সাথে তিনি ছিলেন দা'য়ী, সংগঠক, ছাত্রনেতা এবং হাদীস বিশারদ।

জন্ম:

খুররম জাহ্ মুরাদ ১৯৩২ সালে ভারতের ভূপালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পরিবারসহ তিনি লাহোরে চলে আসেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন।

শিক্ষা ও ক্যারিয়ার:

পাকিস্তানে যখন তিনি দাওয়াতী কাজ শুরু করেন, তখন তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। খুররম জাহ্ মুরাদ করাচির NED University of Engineering and Technolog থেকে পুরকৌশল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একই বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন University of Minnesota থেকে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পাকিস্তানের বহু উন্নয়ন কাজ ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। আইয়ুব খানের আমলে ১৯৬৫ সালে মাতুয়াইল, মুসলিম নগর, যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর, কদমতলী, ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, ফতুল্লা থানাসহ ৫৭ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বন্যামুক্ত এলাকা গড়তে প্রতিষ্ঠা করা হয় ডিএনডি বাঁধ। এই প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন খুররম জাহ্ মুরাদ। ১৯৭৫ সালে সৌদি বাদশাহ পবিত্র কাবা ঘরের এক্সটেনশন কাজ শুরু করেন। এই কাজের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন খুররম জাহ্ মুরাদ। তিনি এর জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহন করেননি। এই বদান্যতার পুরস্কার হিসেবে মসজিদুল হারামের আটটি দরজার মধ্যে একটি দরজা ইঞ্জিনিয়ার মুরাদের নামে নামকরন করা হয়েছে। দরজাটির নাম 'বাবে মুরাদ'।

খুররম জাহ্ মুরাদ পাকিস্তানে তার দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করলেও আফ্রিকায় তিনি দাওয়াতের কাজ ও ইসলামী সংগঠন প্র তিষ্ঠার কাজ করেছেন। একজন শিক্ষক ও দা'য়ী হিসেবে তিনি বহু মানুষের প্রেরণার প্রতীক হয়ে আছেন। পাকিস্তান ইসলামী আন্দোলন প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান হিসেবে পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম চালিয়ে তিনি ইসলামী আন্দোলনের যুবকদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, UK এর ডিরেক্টর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। লাহোর থেকে প্রকাশিত 'তরজুমানুল কুরআনের' সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম রহমতে অবশেষে আরেকটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে পারলাম। এই বইটিতে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গল্প রয়েছে- যা রচনা করেছেন মরহুম খুররম জাহ্ মুরাদ। তাঁকে নিয়ে আমাদের মনে অনেক বেশি আবেগ সঞ্চিত রয়েছে। বিশেষ করে যারা ইসলামকে ভালোবাসেন, ইসলামকে নিয়ে কাজ করেন, তাদের সকলের জন্যই খুররম জাহ্ মুরাদ একটি প্রেরণার নাম।

খুররম জাহ্ মুরাদ একজন স্বার্থক প্রকৌশলী, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক এবং খুব উঁচু মানের সংগঠক। বিভিন্ন সময়ে পেশাগত ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার পর জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউকেতে কাজ করেছিলেন। আগাগোড়াই তিনি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে মুসলমানদের মননে ও মগজে ইসলামের মূল চেতনাকে গেঁথে দেয়ার অভিপ্রায়ে কাজ করে গেছেন। এই বইগুলো তার জীবনের সেই সময়গুলোর অমর কিছু সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম।

মরহুম খুররম জাহ্ মুরাদের চারটি বই অনুবাদ করে এই বইটিতে সন্নিবেসিত করা হয়েছে। বইগুলোর নাম হলো, Love Your God, The Longing Heart, The Persecutor Comes Homes এবং The Brave Boy. এর বাইরে আরো দুটি গল্প আছে, যা আমি অনলাইন থেকে সংগ্রহ করেছি। আমি আমার শৈশবকাল থেকেই বাসার বুকসেলফে এই বইগুলো দেখেছি। সেই সময়ে মোটেও জানতাম না যে, জীবনের কোনো এক পর্যায়ে আমি সাহিত্য রচনা বা অনুবাদের জগতে কাজ করার সুযোগ পাব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই বইগুলো যখনই দেখতাম, অনুবাদ করার আগ্রহ হতো এবং আল্লাহর কি ইচ্ছা, সত্যি সত্যি এতো বছর পর এসে বইগুলো অনুবাদ করতে পারলাম।

মূল বইগুলো আকৃতিতে বেশ ছোট। তাই চারটা বইকে এক জায়গায় আনতে হয়েছে। এগুলো অনেকটা পকেটে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো সাইজেই মরহুম খুররম জাহ্ মুরাদ রচনা করেছিলেন। তার আশা ছিল, পশ্চিমা ইয়ং রিডার্স তথা অল্পবয়সি কিশোর-কিশোরীরা এই বইগুলো পড়ার মাধ্যমে ইসলামের স্বর্ণালী যুগের ইতিহাস জানার সুযোগ পাবে। বইগুলো

তিনি সেই মানসিকতা থেকেই লিখেছেন। তবে আমি অনুবাদ করতে গিয়ে অনুভব করেছি যে, সব বয়সের পাঠকরাই এই বইয়ের গল্পগুলো পড়ে তৃপ্ত হবেন, চিন্তার খোরাক পাবেন। সেই সাথে নিজেকে ইসলামের অনন্য সাধারণ চেতনায় সমৃদ্ধ করার অনুপ্রেরণা পাবেন।

এই বইটি প্রকাশনা সংস্থা 'বিন্দু প্রকাশ' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। 'বিন্দু প্রকাশ' একেবারেই নতুন একটি প্রতিষ্ঠান। তারা তাদের প্রকাশনা কার্যক্রমের শুরুতেই আমাকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং আমার অনূদিত বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। একসাথে কাজ করার সুযোগ দেয়ায় আমি তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দোয়া করি, আল্লাহ তাদের সামনের চলার পথকে সহজ ও বরকতময় করে দিন।

বই রচনা বা অনুবাদ করা বেশ কঠিন কাজ। নিজের পরিবার ও আপনজনদের বঞ্চিত না করে এই জাতীয় কাজ করা যায় না। তাই পরিবারের সকল সদস্য, বিশেষত আমার মা, স্ত্রী ও সন্তানসহ আমার আত্মার আত্মীয় সকলের প্রতি আমার নিরন্তর কৃতজ্ঞতা। সময়ে অসময়ে তারা আমার পাশে থাকেন, আমাকে সমর্থন যোগান বলেই আমি এই কাজগুলো করতে পারছি।

সব বয়সি পাঠকদের ইসলামের সুমহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আমরা এই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। ইসলামের সোনালি যুগের মানুষেরা কিভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতেন, রাসূলকে (সা) কতটা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতেন- সে সম্পর্কে সম্মানিত পাঠকদের কিছুটা ধারণা দেয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। পাঠকের ভালো লাগলে আমাদের যাবতীয় পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সামান্য এই খেদমতকে কবুল করে নিন। আমিন।

দোয়া কামনায়

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা।

সূচিপত্র

আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন

ঘুটঘুটে অন্ধকার এক রাত। মাঝরাতও পার হয়ে গেছে। অল্প কিছু সময় পরেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। কুরাইশরা হয়তো তখন বুঝতে পারবে, তারা যে নবি মুহাম্মাদকে (সা) আটক করতে এসেছিল, তিনি তাদের চোখের সামনে দিয়েই বের হয়ে গেছেন, তারা তা বুঝতেও পারেনি। হয়তো তারা আবার নবিজিকে (সা) খুঁজতে শুরু করবে। শহরের কোনো রাস্তা কিংবা অলি গলি কোনো কিছুই তারা বাদ দেবে না। তন্নতন্ন করে খুঁজবে। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা) আগেই জানতে পারেন, তাঁর প্রতিপক্ষ কুরাইশরা তাকে হত্যা করতে আসছে। তাই তিনি আগেভাগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর বিছানায় তখন শুয়েছিল চাচাতো ভাই আলী (রা)। হযরত আলী (রা) তখন একেবারেই কিশোর। সারারাত কুরাইশের বারো জন তরতাজা ও শক্তিশালী যুবক নবিজির বাসা ঘিরে রেখেছিল, যাতে তিনি

কোনোভাবেই বাইরে কোথাও চলে যেতে না পারেন। তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, রাত শেষ হলেই তারা বাসার ভেতর প্রবেশ করবে এবং নবিজিকে (সা) হত্যা করবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কুরাইশরা তাঁকে হত্যার জন্য পাগলপারা, যে কোন সময় হত্যা করতে পারে। এখনই নবিজির (সা) নিজ শহর মক্কা থেকে হিজরত করা অর্থাৎ মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে এই বার্তা পেয়েই নবিজি (সা) হিজরত করার যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যান মিসফালায়। যেখানে তাঁর প্রিয় বন্ধু ও বিশ্বস্ত সাহাবি হযরত আবু বকরের (রা) বাসা। তাদের দুই বন্ধুর যাওয়ার কথা মদিনায়। মদিনা ছিল মক্কা নগরীর উত্তরে। কুরাইশদের একটু ভুল বার্তা দেয়ার জন্য তাঁরা ইচ্ছে করেই চলে যান দক্ষিণে। তাঁরা জানতেন যে, কুরাইশরা যখন টের পাবে নবি মুহাম্মাদ (সা) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন, তখন তারা প্রথমেই আবু বকরের (রা) বাসায় তল্লাশি করবে আর তারপর গোটা মদিনার পথ চষে বেড়াবে। এ কারণেই প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা) বন্ধু আবু বকরকে (রা) নিয়ে মক্কার দক্ষিণে অগ্রসর হলেন।

হযরত আবু বকর (রা) পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন নবি মুহাম্মাদকে (সা)। হযরত মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত পাওয়ার পর প্রথমদিকে যে অল্প কয়েকজন মানুষ তাঁর উপর ঈমান আনেন, হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর জমানো অর্থ-সম্পদের সবটুকুই ইসলামের জন্য বিলিয়ে দেন। রাসূল (সা) মদিনায় যাওয়ার এই সফরে তাকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন। মদিনার পথে এই যাত্রা ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মদিনায় হিজরত আর তার পরবর্তী ঘটনা মানব ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন এক স্বর্ণযুগের সূচনা করে।

কিছু পথ এগিয়ে তাঁরা দুজন মক্কার দক্ষিণে পাহাড়ি এলাকার কাছাকাছি পৌঁছলেন। তাঁরা তখন এমন এক জায়গা খুঁজছিলেন, যেখানে তাঁরা কিছু সময়ের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। কুরাইশরা

কোনোভাবেই বাইরে কোথাও চলে যেতে না পারেন। তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, রাত শেষ হলেই তারা বাসার ভেতর প্রবেশ করবে এবং নবিজিকে (সা) হত্যা করবে।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কুরাইশরা তাঁকে হত্যার জন্য পাগলপারা, যে কোন সময় হত্যা করতে পারে। এখনই নবিজির (সা) নিজ শহর মক্কা থেকে হিজরত করা অর্থাৎ মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে এই বার্তা পেয়েই নবিজি (সা) হিজরত করার যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যান মিসফালায়। যেখানে তাঁর প্রিয় বন্ধু ও বিশ্বস্ত সাহাবি হযরত আবু বকরের (রা) বাসা। তাদের দুই বন্ধুর যাওয়ার কথা মদিনায়। মদিনা ছিল মক্কা নগরীর উত্তরে। কুরাইশদের একটু ভুল বার্তা দেয়ার জন্য তাঁরা ইচ্ছে করেই চলে যান দক্ষিণে। তাঁরা জানতেন যে, কুরাইশরা যখন টের পাবে নবি মুহাম্মাদ (সা) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন, তখন তারা প্রথমেই আবু বকরের (রা) বাসায় তল্লাশি করবে আর তারপর গোটা মদিনার পথ চষে বেড়াবে। এ কারণেই প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা) বন্ধু আবু বকরকে (রা) নিয়ে মক্কার দক্ষিণে অগ্রসর হলেন।

হযরত আবু বকর (রা) পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন নবি মুহাম্মাদকে (সা)। হযরত মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত পাওয়ার পর প্রথমদিকে যে অল্প কয়েকজন মানুষ তাঁর উপর ঈমান আনেন, হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর জমানো অর্থ-সম্পদের সবটুকুই ইসলামের জন্য বিলিয়ে দেন। রাসূল (সা) মদিনায় যাওয়ার এই সফরে তাকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন। মদিনার পথে এই যাত্রা ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মদিনায় হিজরত আর তার পরবর্তী ঘটনা মানব ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন এক স্বর্ণযুগের সূচনা করে।

কিছু পথ এগিয়ে তাঁরা দুজন মক্কার দক্ষিণে পাহাড়ি এলাকার কাছাকাছি পৌঁছলেন। তাঁরা তখন এমন এক জায়গা খুঁজছিলেন, যেখানে তাঁরা কিছু সময়ের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। কুরাইশরা

যতগুলো ছোট ছোট গর্ত ছিল, যেগুলো দিয়ে সাপ বা অন্য কোনো বিষাক্ত পোকা মাকড় বের হতে পারে, সবগুলো তিনি টুকরো কাপড়গুলো দিয়ে ঢেকে দিলেন। এভাবে পুরো গুহা নিরাপদ করে তিনি বাইরে এলেন এবং নবিজিকে (সা) নিয়ে একসাথে গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন।

প্রিয় নবি (সা) আর হযরত আবু বকর (রা) যখন গুহার ভেতরে ভালোমতো প্রবেশ করলেন, ততক্ষণে প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছে। মক্কায় রাসূলের (সা) বাড়ি যে বারো জন যুবক ঘেরাও করে রেখেছিল, তারাও একই সময়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করল। কিন্তু একি! বিছানায় তো মুহাম্মাদ (সা) নেই, আছেন তাঁর কিশোর চাচাতো ভাই আলী (রা)। এই দৃশ্য দেখে তারা খুবই রেগে গেল। হতাশও হয়ে পড়ল। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা তখনই মক্কার আশেপাশে নবিজির (সা) সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে দিল। তারা ঘোড়া চালিয়ে টগবগিয়ে ছুটে গেল মদিনার পথে। কিন্তু সেই পথ দিয়ে নবিজি (সা) গেছেন এমন কোনো চিহ্নই তারা দেখতে পেল না। তাই তারা সেদিক থেকে ফিরে আসলো। এরপর তারা পূর্ব দিকে,পশ্চিম দিকে, দক্ষিণ দিকে-সবদিকে একইভাবে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। এভাবে খুঁজতে খুঁজতেই তারা একটা সময়ে নবিজির পায়ের চিহ্ন দেখতে পেল। সেই পায়ের চিহ্নটা চলে গেছে মক্কার দক্ষিণে থাকা পর্বতমালার দিকে। তাই তারা দলবেঁধে সেদিকেই ছুটল।

হযরত আবু বকর (রা) নবিজিকে (সা) নিয়ে গুহার ভেতরে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু খুবই পেরেশান ছিলেন। যদিও তাঁরা কুরাইশদের বিভ্রান্ত করার জন্য মক্কা থেকে মদিনার যাত্রাপথের বিপরীত দিকে গেছেন। কিংবা যদিও তাঁরা এতোটাই দুর্গম একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন যেখানে কুরাইশদের আসার কথা নয়, তা স্বত্ত্বেও আবু বকরের (রা) অস্থিরতা কোনো ভাবেই কমছিল না। তিনি বার বার এপাশ ওপাশ দেখছিলেন আর পেরেশান হচ্ছিলেন।

যেই ভয় হযরত আবু বকর (রা) পেয়েছিলেন, শেষমেষ তাই হলো। তাঁরা গুহার বাইরে মানুষের আওয়াজ ও পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন।

বেশ কয়েকজন লোক হযরত আবু বকর (রা) আর তার প্রিয় রাসূলের (সা) পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে সেখানে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু তাঁরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, গুহার মুখে একটি মাকড়সা বাসা বেঁধেছে। মাকড়সার বাসা দেখে তাদের মনে হলো যে, এটা বেশ পুরনো। এর ভেতরে খুব সাম্প্রতিককালে কেউ প্রবেশ করেছে- এমনটা তাদের মনে হলো না। তৎকালীন সময়ে মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখে তাকে খুঁজে বের করার বিদ্যা অনেকেই চর্চা করত। মক্কায় এই কাজটি সবচেয়ে ভালো যারা পারত, তার মধ্যে একজন ছিল কুর্জ বিন আলকামা। সে মূলত সাওর গুহায় নবিজির (সা) পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে সেও বেশ সংশয়ে পড়ে গেল। সে তার সঙ্গীদের বলল, "পায়ের ছাপ এ পর্যন্ত এসেছিল ঠিকই কিন্তু তারপর কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। তারা এখান থেকে কোথায় চলে গেল ?"

সে সময়ে তাদের সাথে কুরাইশদের অন্যতম এক গোত্র প্রধান উমাইয়া বিন খালাফও ছিল। সে বলল, "মাকড়সার এই জাল ছিন্ন করে গর্তের ভেতরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গর্তটা দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে, এখানে সহসা কেউ ঢুকেনি। মাকড়সার জাল এতোটাই পুরনো, মনে হচ্ছে এটা মুহাম্মাদের জন্মের আগেই তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয়, এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।"

আরেকজন কুরাইশ সদস্য গর্তের মুখের এতোটাই কাছে চলে এলো যে, গর্তের ভেতর থেকে রাসূল (সা) ও আবু বকর (রা) তার পাদুটো বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখতে পেলেন। আবু বকর (রা) লোকটাকে এতো কাছে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি নিজের জীবন নিয়ে মোটেও শঙ্কিত ছিলেন না, তিনি বার বার বরং ভাবছিলেন রাসূলের (সা) না কোনো বিপদ হয়ে যায়। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত গুহার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু নবিজি (সা) ছিলেন একেবারেই শান্ত। তিনি নিজের মতো আপনমনে নামাজ পড়ে যাচ্ছিলেন, দোয়া করছিলেন। নামাজ শেষ করে নবিজি (সা) হযরত আবু বকরের (রা) চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেন আবু বকর (রা) কাঁদছেন। তিনি ফিসফিস শব্দে

নবিজিকে জানালেন, "কুরাইশরা ঠিক আমাদের মাথার উপরে। তারা একটু ভেতরে ঢুকলেই আমাদের দেখে ফেলবে।"

নবিজি (সা) আবু বকরের (রা) কথা শুনে হাসলেন। মায়াভরা চোখে হযরত আবু বকরকে (রা) বললেন, "আপনি এতো ভয় পাচ্ছেন কেন। আমরা তো এখানে দুজন নই, তিনজন। আমাদের দুজনের সাথে আল্লাহ তায়ালাও আছেন।"

আবু বকর (রা) উত্তর দিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমাকে নিয়ে ভীত নই। কিন্তু আমার চোখের সামনে যদি ওরা আপনার কোনো ক্ষতি করে তাহলে আমি কী করব?"

রাসূল (সা) বললেন, "ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে আছেন।"

বিস্ময়কর ব্যাপার। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে একফোটা উদ্বেগ, উত্তেজনা বা উৎকণ্ঠার কোনো ছাপ ছিল না। তিনি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন। কেননা আল্লাহর প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল সবসময়। তিনি ছিলেন দৃঢ় ঈমানের এক অবিচল প্রতিচ্ছবি। রাসূল (সা) সবসময়ই অনুভব করতেন যে, যদিও আল্লাহর কোনো দৃশ্যমান সাহায্য তাদের সামনে নেই, তারপরও আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতপক্ষেই তাদের সাথে আছেন এবং তিনি তাদের রক্ষা করবেন।

"আল্লাহ তাঁর নবিকে সাহায্য করেছিলেন, যখন তাঁকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি স্বীয় সান্তনা নাজিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত তাওবাহ : আয়াত ৪০)

কে তোমাকে বাঁচাবে?

এই গল্পটা রাসূলের (সা) জীবনের এমন একটি সময়ের যখন তিনি নাজ্‌দে যাচ্ছিলেন। তিনি মূলত নাজ্‌দে যাচ্ছিলেন সেখানকার স্থানীয় দুই গোত্র মুহারিব ও গাতফানকে সর্তক করার জন্য, যাতে তারা আর কোনো ঝামেলা বা সংঘাতে না জড়ায়। রাসূল (সা) এবং তার সঙ্গীরা যাত্রাপথে নাখলা নামক একটি স্থানে বিরতির জন্য থামেন। খবর যা পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে গাতফান গোত্র খুবই উত্তেজিত অবস্থায় ছিল এবং তারা প্রকাশ্যে যে কোনো স্থানে রাসূলের (সা) উপর আক্রমণ চালাতে পারে এমন তথ্য ছিল। গাতফানদের অধিকাংশ সদস্যই মরুভূমি বা পাহাড়ে ছিল। কিন্তু অল্প কিছু সদস্য এর বাইরেও ছিল, যারা রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবিদের তাবুর আশপাশেই লুকিয়ে ছিল। রাসূল (সা) খুব ভালো করেই জানতেন যে, লুকিয়ে থাকা এই গাতফান সদস্যরা সুযোগ বুঝে তাদের উপর হামলা চালাতে পারে। সে কারণে

নবিজি ও তার সঙ্গীরা খুবই সতর্ক অবস্থায় ছিলেন। এ রকম পরিস্থিতিতে সঙ্গী সাহাবিদের ভয় তাড়ানোর জন্য রাসূল (সা) বেশ ভালো একটি বুদ্ধি বের করলেন। এতে একদিকে যেমন তাদের ভয় কমবে, ঠিক একইভাবে তারা শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তৈরিও থাকতে পারবে।

রাসূল (সা) তার সঙ্গী সাথীদের দুটি দলে ভাগ করলেন। প্রথম দলকে ক্যাম্প পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো। আর দ্বিতীয় দলটি রাসূলের (সা) সাথে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখনই দ্বিতীয় দলটির নামাজ শেষ হলো, তারা আবার গিয়ে ক্যাম্প পাহারা দেয়ার দায়িত্ব নিল আর প্রথম দলটি পাহারার দায়িত্ব থেকে বিরতি নিয়ে নামাজে শরিক হলো। দূর থেকে যে গাতফান সদস্যরা লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যাম্পের উপর নজর রাখছিল তারা গোটা দৃশ্যটা দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। তারা দেখছিল, কিছু লোক নীরবে পাহারা দিয়ে যাচ্ছিল, আবার কিছু লোক নবি মুহাম্মাদের (সা) পেছনে নামাজও পড়ছিল। মুহাম্মাদ (সা) একটু পর পর আল্লাহু আকবার বলছিলেন আর পেছনে থাকা সঙ্গীরাও তাতে সাড়া দিচ্ছিলেন। তারা সবাই একত্রে রুকুতে যায়, একত্রে সিজদা দেয় আবার সিজদা শেষে একই সাথে দাঁড়ায় এবং সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করে। তারা এর আগে কোনো বাহিনীকে এমন দেখেনি যারা একই সাথে পাহারা দেয়ার কাজও করে আবার ইবাদতও পালন করে, তাও আবার পালাক্রমে।

নামাজ শেষে মদিনা থেকে নাজ্‌দ যাত্রার দীর্ঘ পথের ক্লান্তির প্রভাব সাহাবিদের উপর এসে ভর করল। বেশ কিছু সাহাবি পাহারা দেয়ার কাজটি অব্যাহত রাখলেন আর অন্যরা একটু বিশ্রামে নিতে চলে গেলেন। তারা কেউ গাছের নিচে, কেউ বা ঝোপের নিচে শুয়ে পড়লেন। রাসূল (সা) নিজেও একটি গাছের নিচে অন্ধকার একটি জায়গা পেয়ে সেখানে একটু বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করলেন।

ঠিক এমন একটি সময়ের জন্যই গাওরাস অপেক্ষা করছিল। গাওরাস হলো গাতফান গোত্রের সাহসী এক যুবক। ঠিক একদিন আগে যখন তারা নবিজিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল তখন এই

গাওরাস গর্ব করে তার গোত্রের অন্যান্য লোকদের বলছিল, "আমি তোমাদের মতো ভীতু নই। তোমরা কেন মুহাম্মাদকে এতোটা ভয় পাচ্ছ? তাকে হত্যা কর, দেখবে কিছুই হবে না। তোমরা যদি সাহস না পাও, তাহলে আমিই যাব এবং তাকে হত্যা করব। একজন মানুষকে হত্যা করা তেমন কোনো আহামরি কাজ নয়।"

তার সাহসী বক্তব্য শুনে গোত্রের সবাই উজ্জীবিত হলো। তারাও এসে গাওরাসকে উৎসাহ দিল আর বলল, "ঠিকই বলেছ, ওকে হত্যা করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি এগিয়ে যাও, আমরা তোমার সাথে আছি। কিন্তু আমাদের বল যে, তুমি কিভাবে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছ?"

গাওরাস উত্তর দিলেন, "তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। শুধু সুযোগ বুঝে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমি এমনভাবে তাকে আক্রমণ করব যে সে নিজেও বিস্মিত হয়ে যাবে।" এ কথা বলেই গাওরাস আগের দিন সভা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন খুব গরম পড়ছিল। গাওরাস আস্তে আস্তে মুসলমানদের তাবুর কাছে চলে গেল । তার বেশ কাছেই তখন দুজন পাহারারত সাহাবি। আর অল্প দূরেই আরো চারজন বিশ্রাম নিচ্ছিল। তবে তারা বেশ জোরে নাক ডাকছিল, মনে হচ্ছিল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অন্য যারা ছিল, তারা একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে এককেজন এককে স্থানে যে যার মতো ছিল।

কিন্তু গাওরাসের কি ভাগ্য। তার ডানেই শুয়েছিলেন নবি মুহাম্মাদ (সা)। গাওরাস তাকে দেখে ঠিকই চিনেছিল। নবি (সা) গাছের নিচে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর তলোয়ারও খুব কাছাকাছি দেখা যাচ্ছিল না। গাওরাসের কাছে তার তলোয়ার ছিল। সে শুধু ভাবছিল, যদি সে সত্যিই তার তলোয়ার দিয়ে নবি মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করতে পারে তাহলে সে পুরোপুরি বিখ্যাত হয়ে যাবে।

গাওরাস হামাগুড়ি দিয়ে সেই গাছের কাছে চলে গেল যার নিচে নবিজি (সা) শুয়ে ছিলেন। তারপর সে আস্তে করে মাথা তুলল। নিজের কোমরে বাঁধা তরবারির খোলস থেকে তলোয়ারটা বের করল

এবং নবিজির মুখের উপরে তলোয়ারটা তাক করল। ঠিক তখনই নবি মুহাম্মাদ (সা) চোখ মেললেন। তার চোখ সরাসরি গিয়ে পড়ল গাওরাসের চোখে। গাওরাস তলোয়ারটি তখনই নবিজির (সা) উপর চালাতে চাইছিল, কিন্তু নবিজির (সা) শান্ত চাহনি তাকে কেমন যেন সংশয়ে ফেলে দিল।

গাওরাস নবিজিকে (সা) প্রশ্ন করলেন, "হে মুহাম্মাদ, আপনি কি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন না?"

রাসূল (সা) একেবারে শান্ত ধীর স্থির ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, "না, মোটেই না। কেন আমি তোমাকে ভয় পাব?"

গাওরাস বলল, "কিন্তু আমার তলোয়ার আপনার দিকে তাক করা, যে কোনো মুহূর্তে তা নেমে আসবে। কেন তাহলে আপনি আমাকে ভয় পাবেন না? আমার হাত থেকে কে আপনাকে বাঁচাবে?"

প্রিয় নবি (সা) একেবারেই শান্ত রইলেন। তাঁর চেহারায় ভয় বা আতঙ্কের ছিটেফোটাও দেখা যাচ্ছিল না। তিনি আবারও ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিলেন, "আল্লাহই আমাকে তোমার আর তোমার তলোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করবেন।"

গাওরাস নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে প্রশ্ন করল, "আপনি কার কথা বললেন মুহাম্মাদ? কে আপনাকে রক্ষা করবে?"

রাসূল (সা) আবার বললেন, "আমার রব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে রক্ষা করবেন।"

গাওরাসের যেন কি হয়ে গেল । সে কোনোভাবেই তলোয়ার নাড়াতে পারছিল না। তার সারা শরীর যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিল। একটা সময় তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল ।

এবার রাসূল (সা) নিজেই পড়ে থাকা সেই তলোয়ারটি হাতে তুলে নিলেন আর গাওরাসকে প্রশ্ন করলেন, "এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?"

গাওরাসের বলার মতো কোনো উত্তর ছিল না। মনে হচ্ছিল তার আর কেউ নেই।

কিছু সময় পর নবিজি (সা) নিজেই কথা বললেন। তিনি গাওরাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তলোয়ারটি নাও। আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি এই তলোয়ারটি ভালো কাজে ব্যবহার করবে।"

রাসূলের (সা) সাহাবিরা ততক্ষণে ঘটনা টের পেয়ে গেছেন। তারা হুড়মুড় করে সবাই দৌড়ে এলেন। কেউ কেউ গাওরাসকে শক্ত করে জাপটে ধরলেন- যেন এখনই তারা তাকে হত্যা করবেন। কিন্তু নবিজি (সা) তাদের আগ্রাসী হতে নিষেধ করলেন। বরং শান্ত থাকতে বললেন। তিনি গাওরাসকে ক্ষমা করে দিলেন এবং সাহাবিদেরও নির্দেশ দিলেন যাতে কোনো ধরনের শাস্তি না দিয়েই ওকে তাৎক্ষণিকভাবে ছেড়ে দেয়া হয়।

নবিজি (সা) গাওরাসের দিকে ফিরে তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহই একমাত্র প্রভু এবং তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদত করা যাবে না?"

গাওরাস মাথা নাড়ল। বলল, "না, আমি যদি এখন এমনটা বলি, তাহলে সবাই ভাববে আমি বোধ হয় ভয়ে বলেছি। আমি বরং অন্য একটি ওয়াদা করি। আজকের পর থেকে আমি আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। এমনকি যারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাদেরকেও আমি সমর্থন করব না।"

এই ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে গাওরাসকে ছেড়ে দেয়া হলো। গাওরাস তার গোত্রের কাছে ফিরে গেল। তার প্রতিবেশিরা সবাই তখন ছুটে এসে তাকে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে? কেন তাকে হত্যা করতে পারলে না?"

গাওরাস উত্তর দিল, "আমি এমন একজন মানুষের কাছ থেকে এসেছি, যিনি পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানুষ।"

সুবহানআল্লাহ। এভাবেই পরশ পাথর নবিজির (সা) সংস্পর্শে এসে হত্যা করতে আসা গাওরাস উল্টো তার ভক্ত হয়ে ফিরে গেল।

আল্লাহর সাথে থাকার বাসনা

রাসূল (সা) তখন মদিনায় থাকেন। মদিনার আশপাশে এবং গোটা আরব জুড়ে আরো বহু গোত্র ও বংশ আছে যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় রব এবং হযরত মুহাম্মাদকে (সা) শেষ নবি হিসেবে মেনে নেয়নি। বরং এসব গোত্রের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা নবিজি (সা) এবং তাঁর সাহাবিদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। ভেতরে ভেতরে তারা রাসূলকে (সা) হিংসা করতেন। সবসময় তারা সুযোগ খুঁজতেন যাতে সুযোগ মতো তারা রাসূলকে (সা) তার সঙ্গী সাথীসহ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। রাসূলের (সা) উপর তাদের রাগ বেশি ছিল। তার কারণেই সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর দেব-দেবতার পূজা করার বদলে আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করেছিল।

এসব গোত্রগুলো সবসময়ই নবি মুহাম্মাদ (সা) এবং তার সাথীদের

হত্যা করার জন্য ভীষণ তৎপর থাকত। মদিনায় বসবাসরত মুসলমানদের পক্ষেও ইসলামের দাওয়াতি কাজ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। এমনকি তারা তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমও ঠিক মতো করতে পারত না। তারা খেজুর উৎপাদন করতে বা মৌসুম শেষে গাছ থেকে খেজুর সংগ্রহ করতে গিয়েও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ছিল। ফলে মুসলমানরা ক্রমশ অভাব, দারিদ্রতা আর খাদ্যকষ্টে পড়ে যাচ্ছিল আর এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার মতো কোনো উপায়ও চোখে পড়ছিল না।

মদিনার মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি করছিল মুহারিব ও গাতফান গোত্র। নিতান্ত বাধ্য হয়েই রাসূলকে (সা) তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে এই দুই গোত্রকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করতে হলো।

এই দুই গোত্রের প্রধান ব্যক্তিরা যখন জানতে পারল নবি মুহাম্মাদ (সা) তার সাহাবিদের নিয়ে তাদের আক্রমণ করার জন্য আসছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। ময়দানে গিয়ে রাসূল (সা) আর তার সঙ্গীরা শত্রুদের কাউকেই দেখতে পেলেন না। তারা আবার মদিনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ততক্ষণে রাত হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা একটি সরু পাহাড়ি উপত্যকায় শিবির স্থাপন করল। রাসূল (সা) সাহাবিদের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে তাবু তৈরি করতে এবং রাতের খাবারও প্রস্তুত করতে বললেন। উপত্যকার মুখ দিয়ে যাতে হুট করে শত্রুপক্ষের কেউ প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য রাসূল (সা) প্রবেশ মুখে পাহারা বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মুহাজির সাহাবি আম্মার বিন ইয়াসির (রা) এবং আনসার সাহাবি আব্বাদ বিন বিসরকে (রা) তিনি পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিলেন।

আম্মার ও আব্বাদ (রা) মিলে প্রবেশ মুখের কাছেই একটি চমৎকার জায়গাকে বাছাই করলেন, যেখান থেকে একই সাথে মুসলমানদের বসতি শিবির দেখা যায়, আবার প্রবেশ মুখটাকেও ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। আব্বাদ (রা) তার সাথে খুবই মূল্যবান জিনিস নিয়ে

এসেছিলেন। তার কাছে হরিণের চামড়ার তৈরি একটি কাগজ ছিল, যেখানে তিনি তার প্রিয় সূরাটি লিখে এনেছিলেন। কাগজটি তার পকেটেই ছিল। যখন এই যুদ্ধের ঘোষণা এলো এবং তাকে মদিনা থেকে বেরিয়ে আসতে হলো, তখনও তিনি এই সূরাটি মুখস্থ করার চেষ্টা করছিলেন। তখন থেকে কাগজটা তার পকেটেই ছিল। আব্বাদ (রা) তার সঙ্গী আম্মারকে (রা) বললেন, "প্রিয় ভাই, আসুন আমরা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বটি দুই ভাগে ভাগ করে নিই। রাত্রের একটি অংশে একজন পাহারা দিব, আর অপর অংশে অন্যজন। আপনি কি রাজি?"

আম্মার (রা) বললেন, "জি, আমি রাজি।"

আব্বাদ (রা) আবার তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি রাতের কোন ভাগে দায়িত্ব পালন করতে চান, এখন নাকি পরের অংশে?"

আম্মার (রা) বললেন, "আমার এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি এখন কাজটা ভালোভাবে করতে পারব না। আমি বরং রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে নিই। দ্বিতীয় অংশে আমি পাহারা দিব ইনশাআল্লাহ।"

আব্বাদ (রা) বললেন, "কিন্তু দ্বিতীয় অংশে দায়িত্ব পালন কঠিন হবে বেশি। তখন আপনার জেগে থাকতে আরো বেশি কষ্ট হবে।"

আম্মার (রা) বললেন, "অসুবিধা নেই। আমার নামাজ পড়ার নিয়ত আছে। নামাজ পড়লে আর সহজে ঘুম আসবে না ইনশাআল্লাহ।" এভাবেই দুই সাহাবি নিজেদের মধ্যে কাজটি বোঝাপড়া করে নিলেন।

এদিকে শত্রুপক্ষের (গাতফান গোত্রের) একজন সদস্য দূর থেকে রাসূল (সা) আর তার সাহাবিদের তাবুগুলোর উপর নজর রাখছিল। যে জায়গা থেকে সে চোখ রাখছিল, তা দুই পাহারারত সাহাবি আম্মার (রা) আর আব্বাদের (রা) অবস্থান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শত্রুপক্ষের এই লোকটি মুসলমানদের উপর বেজায় ক্ষিপ্ত ছিল। তার স্ত্রীও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য একটা সময় প্রাণপণ চেষ্টা করত। এরকমই এক চেষ্টা করতে গিয়ে একটি খণ্ড যুদ্ধে লোকটির স্ত্রী নিহত হয়। তারপর থেকে এই ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেছে কমপক্ষে একজন সাহাবিকে হত্যা করে হলেও সে তার স্ত্রী হত্যার প্রতিশোধ নেবে।

সে যখন উপত্যকার প্রবেশ মুখের দিকে এগিয়ে আসছিল, ঠিক তখনই আব্বাদ (রা) নামাজে দাঁড়াচ্ছিলেন। তিনি বসতি শিবিরের সামান্য আলোতেই তার নতুন শেখা সূরাটি দিয়ে নামাজ শুরু করলেন। এভাবে পড়তে পড়তেই তিনি কেমন যেন ঘোরে চলে গেলেন। সেই সূরার আয়াতগুলো তাকে এতোটাই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল, তার ঈমান এতোটাই বেড়ে গেল এবং তিনি ইবাদতে এতোটাই নিবিষ্ট হয়ে পড়লেন যে, তিনি তার চারপাশের বাস্তবতা এক রকম ভুলেই গেলেন। তিনি তখন সূরা আর রাহমানের আয়াতগুলো পড়ছিলেন,

"তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?" (সূরা আর রাহমান : ১৮-১৯)

সাহাবিকে এভাবে তন্ময় হয়ে ইবাদত করতে দেখে অপেক্ষমান শত্রুর চোখ যেন জ্বলে উঠল। সে তার ধনুকে শক্ত করে তীর গেঁথে আব্বাদকে (রা) টার্গেট করে তীরটা ছুড়ে দিল। তীরটা সোজা গিয়ে আব্বাদের (রা) শরীরের এক পাশে বিঁধল। আব্বাদ (রা) তীরটি হাত দিয়ে টান দিয়ে বের করে পাশে রেখে দিলেন এবং তার তেলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন।

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সব কিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনি সর্বদাই কোনো না কোনো কাজে রত আছেন। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?" (সূরা আর রাহমান : আয়াত ২৯-৩০)

গাতফান গোত্রের সেই ব্যক্তি নিজের মনেই ঐ সাহাবিকে গালি দিল। আবার সে একটি তীর ধনুকে স্থাপন করল এবং আব্বাদকে (রা) লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। এবার তীরটা গিয়ে লাগল আব্বাদের (রা) পায়ে। আব্বাদ (রা) নিচু হয়ে পা থেকে তীরটি বের করে তেলাওয়াত করতে থাকলেন।

এরপর তৃতীয় তীরটি যখন গিয়ে তার শরীরে লাগল এবং ক্ষতস্থানগুলো থেকে বেশি রক্ত বের হতে শুরু করল তখন আব্বাদ

(রা) তার তেলাওয়াত শেষ করলেন। তিনি রুকুতে গেলেন, সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলেন। তারপর তিনি তার সঙ্গী হযরত আম্মারকে (রা) ডেকে তুললেন।

আব্বাদ (রা) একটু নিচু হয়ে তার সহকর্মীকে ডাকছিলেন বলে গাতফান গোত্রের লোকটি মনে করল বোধ হয় তৃতীয় তীরটিতে কাজ হয়েছে এবং তিনি মারা গেছেন। সে আনন্দে মাথা উঁচু করে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু যখন সে দেখতে পেল পাহারায় একজন নয় বরং দুজন আছেন এবং দুজনই জীবিত আছেন, তখন সে ঘাবড়ে গেল। তার মনে ভয় জাগল সে ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই সে আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেকে দৌঁড়ে পালিয়ে গেল।

হযরত আব্বাদের (রা) ডাক শুনে আম্মার (রা) ঘুম থেকে উঠলেন। যখনি তার চোখ প্রিয়তম সঙ্গী আব্বাদের (রা) উপর পড়ল, তিনি রীতিমতো চমকে উঠলেন। প্রশ্ন করলেন, "প্রথম যখন আপনার শরীরে তীর এসে লাগল, আপনি কেন তখনি আমাকে ডেকে তোলেননি?" আম্মার (রা) খুবই অপরাধবোধে ভুগছিলেন। তার বন্ধু এতো আঘাত পেল, অথচ তিনি কিছুই টের পেলেন না, উল্টো দিব্যি ঘুমিয়ে কাটালেন। এই বিষয়টা তাকে খুবই ব্যথা দিয়েছিল। যাহোক, তিনি তাড়াতাড়ি আব্বাদের (রা) ক্ষতস্থানগুলোতে ব্যান্ডেজ লাগানোর চেষ্টা করলেন।

আব্বাদ (রা) হযরত আম্মারের (রা) অস্বস্তি ও অনুশোচনাবোধ দেখে হেসে ফেললেন আর বললেন, "আম্মার (রা) আপনার কোনো দোষ নেই। প্রকৃতপক্ষে আমি এতো বেশি আনন্দে ছিলাম, এতো বেশি প্রশান্তি পাচ্ছিলাম যে, তীরের আঘাত টেরই পাইনি। আমি শুধু কোনো রকমে তীরগুলো বের করে সূরাটি পড়ে যাচ্ছিলাম। তৃতীয় তীরটি যখন এসে বিঁধল ততক্ষণে আমার সূরাটাও শেষ হয়ে গেছে। তাই নামাজ শেষ করেই আমি আপনাকে একবারে ডেকে তুললাম। আমি আরো কিছুক্ষণ এভাবেই সূরা পড়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এরপর যদি আমি মারা যেতাম, আর আপনি টের না পেয়ে ঘুমাতে থাকতেন, তাহলে তো শিবিরে থাকা আমাদের সব সঙ্গীরাই বিপদে পড়ে যেত। আমি তো

কোনোভাবেই আমার সাথীদের, বিশেষ করে প্রিয়নবিকে (সা) ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারি না।"

হযরত আম্মার (রা) আব্বাদের (রা) কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। সূরা আর রাহমানের প্রতি তার এতোটা দরদ আর রাসূল (সা) ও সাহাবিদের জন্য আব্বাদের (রা) অনুভূতি দেখে হযরত আম্মার (রা) নির্বাক হয়ে পড়লেন। তিনি পরম মমতায় আব্বাদকে (রা) জড়িয়ে ধরে রাখলেন। কুরআনের প্রতি রাসূলের (সা) সাহাবিদের দরদ ছিল এমনই। আল্লাহ আমাদেরকেও একইভাবে কুরআনকে ভালোবাসার তাওফিক দিন। আমিন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সা) আমার জন্য যথেষ্ট

বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন একটি খবর দ্রুত বেগে মদিনাসহ আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। বাইজান্টাইনরা এবার সিদ্ধান্ত নিয়েই মাঠে নেমেছে। তারা মুসলমানদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করেই ফিরবে। কিন্তু রাসূল (সা) এসব কোনো সংবাদেই ঘাবড়াননি। তিনি জানতেন ও বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ তায়ালা যদি সাহায্য করেন তাহলে বিশাল সংখ্যার বাইজান্টাইন বাহিনীকে মুসলমানরা সহজেই হারিয়ে দিতে পারবে।

বাইজান্টাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাসূল (সা) জিহাদের ডাক দিলেন। তিনি সকল মুসলমানকে আল্লাহর পথে নিজেদের সর্বোচ্চ কুরবানি দেয়ার আহ্বান করলেন। বাইজান্টাইনরা এবার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করেছে।

তাদেরকে প্রতিরোধের জন্য মুসলমানদেরও ব্যাপক পরিমাণে তলোয়ার, ঢাল ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হবে। তাছাড়া তখন গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড রোদ। এরকম প্রতিকুল সময়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে অভিযানে যেতে হলে মুসলমানদের অনেক বেশি পানিরও প্রয়োজন পড়বে।

এখন প্রশ্ন হলো কারা নবিজির (সা) ডাকে সাড়া দেবে? আর কয়েকদিন পরই ফসল কাটার মৌসুম। এই সময়ে কে আবার যুদ্ধে যেতে চাইবে? কে-ই বা নিজের বাসায় পরিবারের সাথে একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ ছেড়ে এরকম একটি বিশাল শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলা করতে চাইবে? কিংবা কে-ই বা নিজেদের অর্থ ও সম্পদ দান করে ত্যাগ স্বীকার করতে চাইবে?

মুসলমানদের মধ্যে যারা ততটা আন্তরিক নন, ততটা সাহসী নন তারা এই যুদ্ধে যেতে সাহস পেলেন না। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে তারা যে কোনো কিছু করতে এমনকি বড় আকারের ঝুঁকি নিতেও আগ্রহী ছিলেন।

হযরত উমর (রা) ছিলেন এরকমই উন্নত মানসিকতা আর দৃঢ় ঈমানের অধিকারী একজন সাহাবি। রাসূলের (সা) জিহাদের ডাক শুনে তিনি ভাবলেন, "এটাই তো আমার জন্য সবচেয়ে বড় সুযোগ। আমি আল্লাহকে কতটা ভালোবাসি, আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমার বিশ্বাস কতটা মজবুত, রাসূলের (সা) প্রতি আমি কতটা আন্তরিক, এবার আমি তা-ই প্রমাণ করব।" জিহাদের ডাক শুনে তিনি তাড়াতাড়ি নিজের বাসায় চলে গেলেন। পরিবারের সদস্যদের বললেন, "বাসায় যা আছে সবকিছুকে একত্রিত কর।" একত্রিত করার পর তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "শোন, তোমাদের যার যা কিছু আছে তার অর্ধেক রেখে বাকি অর্ধেক আমাকে দিয়ে দাও। আমি সেই সম্পদগুলো রাসূলের (সা) জিহাদ তহবিলে দান করে দিব।"

এই কথা বলে হযরত উমর (রা) নিজেই সবার আগে তার তলোয়ার আর ঢালগুলো নিয়ে আসলেন। তিনি অর্ধেক নিজের জন্য রেখে বাকি সবটুকু জিহাদের তহবিলের জন্য বরাদ্দ রাখলেন। ঠিক

একইভাবে, তার স্ত্রীও নিজের গয়না আর অন্যান্য সম্পত্তির অর্ধেক জমা দিলেন। এই গয়নাগুলো তার খুব কষ্টের। যখন তারা মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করে আসেন, তখন তিনি কোনো মতে এই সামান্য গয়নাটুকুই সাথে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। স্বামীর অনুরোধে তিনি তার কানের দুলের জোড়াটিও খুলে দিয়ে দিলেন।

হযরত উমর (রা) তাকে বললেন, "তুমি কি শোননি, আমি কি বলেছি? আমি অর্ধেকটা দিতে বলেছি। তুমি কানের দুলের একটা রেখে অপরটা জমা দাও।"

হযরত উমরের (রা) স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, "প্রিয়তম স্বামী, তুমি জানো না, আমি যদি তোমাকে একটি কানের দুল দেই, তাহলে বাকি দুলটা কেউ কিনবে না। কারণ এগুলো জোড়া হিসেবেই পরতে হয়। আবার আমি যদি একটা দিয়ে অপরটি নিজের কাছে রেখে দিই, তাহলে আমি নিজেও আর দুলটি পরতে পারব না। তাই আমি তোমাকে দুটাই দিয়ে দিলাম।"

নিজের বাড়ি থেকে যতটুকু স্বর্ণ সংগ্রহ হলো তার পরিমাণ বেশ ভালো হওয়ায় হযরত উমর (রা) খুশিই হলেন। তার দুই হাত ভরেই তিনি মূল্যবান সব জিনিসপত্র নিয়ে এবার রাসূলের (সা) কাছে রওনা দিলেন। যতটুকু তিনি হাতে বহন করতে পারলেন না, ততটুকু নিয়ে তার সন্তানরা পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

যাত্রাপথে তিনি হযরত আবু বকরকে (রা) দেখতে পেলেন। হযরত উমরের (রা) মতো তিনিও নিজের বাসা থেকে সহায়-সম্পত্তি নিয়ে রাসূলের (সা) কাছে যাচ্ছিলেন। তবে পরিমাণে আবু বকর (রা) খুব বেশি আনতে পেরেছেন বলে হযরত উমরের (রা) কাছে মনে হলো না। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তার তেমন ধারণাই হলো।

মনে মনে হযরত উমর (রা) ভাবলেন, "যাক অন্তত একবার আমি আবু বকরকে (রা) ছাড়িয়ে যেতে পেরেছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অন্তত একবার আমি তাকে পেছনে ফেলতে পেরেছি।" এসব ভাবতে ভাবতে মোটামুটি আনন্দ নিয়েই হযরত উমর (রা) রাসূলের (সা) দরবারে প্রবেশ করলেন।

হযরত উমর (রা) নিজের ও সন্তানদের বহন করা যাবতীয় মালামাল রাসূলের (সা) সামনে রাখলেন আর বললেন, "আপনার আহবানের প্রতিক্রিয়ায় এই হলো আমার সামান্য অবদান। আপনি আল্লাহর রাস্তায় যে কোনো ভাবে আমার এই সম্পদগুলো ব্যবহার করতে পারেন।"

রাসূল (সা) হযরত উমরের (রা) ভূমিকায় খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "হে উমর, আপনি আপনার নিজের ও পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছেন?" রাসূলের (সা) মনে এরকম প্রশ্ন এলো, কেননা হযরত উমর (রা) এতো বেশি মালামাল নিয়ে এসেছিলেন যে, রাসূল (সা) আশঙ্কা করছিলেন হযরত উমর (রা) তাঁর পরিবারকে না আবার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেন। তারা না আবার অভাবে পড়ে যায়।

হযরত উমর (রা) নবিজিকে (সা) আশ্বস্ত করে বললেন, "আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। তাদের কাছেও যথেষ্ট আছে।"

রাসূল (সা) আবার প্রশ্ন করলেন, "যথেষ্ট আছে বুঝলাম, কিন্তু কতটুকু?"

হযরত উমর (রা) উত্তর দিলেন, "আমি আপনার সামনে যতটুকু হাজির করেছি ততটুকুই। আমি আমার যাবতীয় সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করেছি। একভাগ নিজেদের কাছে রেখেছি আর অপর ভাগ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছি।"

রাসূল (সা) এবার সন্তুষ্ট হলেন।

এবার হযরত আবু বকর (রা) সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি তার ছোট ব্যাগটি রাসূলের (সা) সামনে রাখলেন। রাসূল (সা) যে প্রশ্নটি হযরত উমরকে (রা) করেছিলেন সেই একই প্রশ্ন হযরত আবু বকরকেও (রা) করলেন। বললেন, "হে আবু বকর, আপনি আপনার নিজের ও পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছেন?"

আবু বকর (রা) এদিক ওদিক তাকাতে থাকলেন। তিনি প্রশ্নের উত্তরটি সরাসরি না দিয়ে বরং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। আবার তিনি রাসূলের (সা) কাছে কিছু গোপনও করতে চাইছিলেন না। তিনি অনেক ভেবে উত্তর দিলেন, "তাদের আছে, তাদের নিয়ে চিন্তার কিছু

নেই। আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই (সা) রেখে এসেছি। আমাদের পরিবারের কাছে সব মিলিয়ে যা ছিল, আমি পুরোটাই আপনার সামনে হাজির করেছি।"

রাসূল (সা) মৃদু হেসে তার ঘনিষ্ঠ সাহাবি ও বন্ধু আবু বকরের (রা) দিকে তাকালেন। এভাবেই আবু বকর (রা) আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে এবং নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে থাকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর একেবারে প্রথম দিন থেকেই হযরত আবু বকর (রা) সবসময়ই নিজের সবটুকু রাসূলের (সা) জন্য বিলিয়ে দিতে শুরু করেন। তিনি হলেন সেই সৌভাগ্যবান মানুষ, যিনি রাসূলের (সা) মদিনায় হিজরতের সময় তার সফরসঙ্গী হিসেবে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) এই ঘটনার পর অনেকটা লজ্জিত হয়েই বাসায় ফিরে আসলেন। তিনি স্বীকার করলেন, "আবু বকর (রা) আরো একবার প্রমাণ করলেন যে, তিনি আমার চেয়ে কত ভালো মানুষ, কত ভালো মানের মুসলমান। আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি আবু বকরের (রা) যে আনুগত্য, ভালোবাসা ও ত্যাগ- তা সীমাহীন। তার তুলনা শুধু তিনি নিজেই।"

আবু তালহা ও এক সুন্দর পাখি

রাসূল (সা) তখন মদিনায় বসবাস করেন। সেখানে আবু তালহা (রা) নামে একজন সাহাবি ছিলেন। আবু তালহা (রা) নিজেকে মদিনার সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মনে করতেন, কারণ তার একটি চমৎকার বাগান ছিল। এতো সুন্দর ও মনোহর বাগান মদিনায় আর কারো ছিল না। বাগানে স্বচ্ছ ও শীতল পানির একটি ঝরণাধারা ছিল। চলমান এই পানির স্রোতধারার কারণেই বাগানটি সবসময় সবুজ, সজীব ও প্রাণবন্ত থাকত।

আবু তালহার (রা) কাছে দিনের সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্ত ছিল বিকেল বেলা। যখন তিনি তার প্রিয় বাগানে আসরের নামাজ আদায় করতেন। মাথার উপর দিয়ে হালকা মৃদু বাতাসে দোল খাওয়া খেজুর গাছের পাতা আর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির শব্দ, সব মিলিয়ে এক অসাধারণ পরিবেশ ছিল সেখানে। বাগানের এই চমৎকার পরিবেশের

জন্যই আবু তালহা (রা) বাগানের ভেতরেই নামাজ পড়তে পছন্দ করতেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, আবু তালহা (রা) একবারের জন্যেও তা ভুলে যেতেন না। তাই সব অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

অন্যসব দিনের মতোই একদিন বিকেলে আবু তালহা (রা) আসরের নামাজ আদায় করার জন্য তার জায়নামাজ নিয়ে বাগানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞ একটি মন নিয়ে বিনয়ের সাথে তিনি নামাজে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই তেলাওয়াত শুরু করলেন, তখনই গাছের পাতার নড়াচড়া আর পানি প্রবাহের চিরচেনা শব্দের পাশাপাশি আরেকটি শব্দ তার কানে প্রবেশ করল। তার মাথার উপর দিয়ে মনকাড়া কিচিরমিচির শব্দ তাকে রীতিমতো বিমোহিত করে ফেলেছিল। মনের অজান্তেই তার চোখ খুলে গেল। সামনে থাকা খেজুর গাছের ডালের উপর তিনি একটি পাখি দেখতে পেলেন। তার মনে হলো পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর পাখি আর নেই। পাখির ডানা ছিল পান্নার মতো সবুজ। আর এর পালক আর লেজটা ছিল ডালিমদানার মতো লাল টকটকে। মাথা ছিল সোনালি বর্ণের। ঠোঁটটাও ছিল অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আর ঠোঁটের ভেতর থেকেই অপূর্ব ধ্বনির সেই কলতান ভেসে আসছিল।

আবু তালহা (রা) মুগ্ধতায় ডুবেছিলেন। তিনি পাখিটির দিকে এমনভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন যে, তিনি একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন যে তিনি কোথায় আছেন বা তিনি কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। যখন তার মনে পড়ল, তিনি ভীষণ লজ্জিত হলেন এবং আবার নামাজে মনোনিবেশ করলেন। যেখানে তিনি তেলাওয়াত থামিয়ে দিয়েছিলেন, আবার সেখান থেকেই তিনি তেলাওয়াত শুরু করলেন। এরপর তিনি স্বাভাবিকভাবেই নামাজ শেষ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে পাখিটি উড়ে চলে গেছে।

কিন্তু উড়ে গেলেই বা কি! পাখিটিরও এই বাগানটা ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। এতো সুন্দর বাগান, যেখানে চাইলেই বীজদানা খাবার হিসেবে পাওয়া যায়, আবার ঝরণাধারাও আছে। পাখির বাসা

বানানোর জন্য এর চেয়ে উত্তম জায়গা আর হতেই পারে না।

পরের দিন আবার আবু তালহা (রা) জায়নামাজ নিয়ে বাগানে তার প্রিয় খেজুর গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন এবং নামাজ শুরু করলেন। কিন্তু আজ তিনি খেয়াল করেননি যে তারই মাথার উপর গাছের ডালে পাখিটি নিজের বাসা তৈরি করে নিচ্ছে। একটু পরই পাখিটা আবারও মিষ্টি সুরে গান গাইতে শুরু করল। আবারও আবু তালহা (রা) নামাজে তাঁর মনোযোগ হারিয়ে ফেললেন। তিনি আবার চোখ খুলে সেই অদ্ভুত সুন্দর পাখিকে দেখতে পেলেন। পাখিটি এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে আর কিচিরমিচির সুরে গান গাইছে।

কিন্তু এবার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আবু তালহা (রা) ঘোর থেকে বাস্তবে চলে এলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "আমি এটা কি করছি? আমি কোন রাকাতে ছিলাম, দ্বিতীয় রাকাতে নাকি তৃতীয় রাকাতে?" কিছুতেই তিনি নিশ্চিতভাবে তা মনে করতে পারলেন না। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। কোনো মতে নামাজ শেষ করলেন। নীরবে জায়নামাজ গুটিয়ে নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আবু তালহা (রা) এরপর অনেকক্ষণ শুধু ভেবেই গেলেন। তিনি চিন্তা করলেন, কিভাবে তাঁর নামাজ আল্লাহর কাছে পৌঁছবে যেখানে তিনি নিজেই ভুলে যান যে তিনি কোন রাকাতে ছিলেন? তাঁর মন যদি বাগান, বাগানের সৌন্দর্য, পাখির গান আর ঝরণাধারার প্রতি এতোটাই মোহবিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তিনি কিভাবে আল্লাহকে স্মরণ করবেন?

আবু তালহা (রা) ছিলেন খুবই উন্নতমানের একজন মুসলমান। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, একজন মুসলমানের জন্য নামাজ কতটা জরুরি। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, নামাজে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ রাখা যায় না। কিন্তু এই সমস্যা থেকে কিভাবে বাঁচবেন তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না।

সেই রাতেই তিনি নবিজির (সা) কাছে চলে গেলেন। নবিজিকে (সা) তিনি তার বাগান, বাগানের সৌন্দর্য, পাখির গান আর ঝরণাধারার বিষয়ে বিস্তারিত সব জানালেন।

তিনি বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ (সা), আমি আমার নামাজ, আমার

ইবাদতের সময় অন্য কিছুকে বাঁধা হিসেবে মেনে নিতে পারব না। যেগুলো আমার নামাজের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, সেগুলো বরং না থাকলেই ভালো। আপনি দয়া করে আমার বাগানটির দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আমি আজ এই মুহূর্ত থেকে আমার বাগানটি আপনাকে দিয়ে দিলাম। মদিনার মুসলমানরা এখন থেকে এই বাগান ব্যবহার করতে পারবে। এর যে কোনো ফল, ফলাদি ও অন্যান্য সামগ্রী নিজেদের প্রয়োজনে বিক্রিও করতে পারবে।"

রাসূল (সা) খুব সন্তুষ্ট মনে আবু তালহার (রা) এই উপহার গ্রহণ করলেন। তারপর থেকে আর কখনোই নামাজ আদায় করতে গিয়ে আবু তালহার (রা) মনোযোগ ছুটে যায়নি। আর তখন থেকেই তাঁর নামাজও আল্লাহ তায়ালা আরও খুশি মনে কবুল করে নিলেন। সুবহানআল্লাহ।

জ্ঞানী এক শিষ্যের গল্প

হাজার বছর আগের বাগদাদ ছিল উজ্জ্বল, ঝকমকে, সম্পদশালী আর বিলাসিতার এক নগরী। যে সময়ের কথা বলছি, তখন বাগদাদ ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী। আর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন বিশ্বখ্যাত শাসক হারুনুর রশিদ। সে সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ী আর বণিকেরা দলে দলে স্বর্ণালংকার, সুগন্ধীসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে বাগদাদ শহরে আসতেন। তারা বাগদাদে আসতেন ব্যবসা করার জন্য। আর বাগদাদের অধিবাসীরাও এতোটা স্বচ্ছল ছিল যে তারাও অবলীলায় মূল্যবান সেসব প্রসাধনী আর সুগন্ধী কিনে নিজেদের সুন্দর করে তোলার খায়েশ পূরণ করত।

এই সব দুনিয়াবি ভোগ বিলাস আর বৈভবের বাইরেও বাগদাদের আরেকটি চেহারা তখন দৃশ্যমান ছিল। পুরো পৃথিবীর মধ্যে বাগদাদই

ছিল তখন সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র। সব ধরনের শিক্ষাবিদ, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিকেরা বাগদাদকে রীতিমতো তীর্থস্থান মনে করত। সে সময় প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার যাবতীয় রচনাবলি ও পুস্তক আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদকদের সম্মানও ছিল অনেক বেশি। জানা যায়, একটি বই আরবিতে অনুবাদ করার পর সেই বইটির যত ওজন হতো, সেই অনুপাতে অনুবাদককে পারিশ্রমিক হিসেবে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হতো।

এতোসব জ্ঞানী আর পণ্ডিত লোকের মাঝে জুনায়েদ নামে একজন বড় মানের শিক্ষাবিদ ছিলেন। পেশায় ছিলেন তিনি একজন শিক্ষক, মানুষ হিসেবে ছিলেন ভীষণ মানবিক আর চরিত্রের দিক থেকে ছিলেন খুবই উন্নত।

জুনায়েদ পারস্য এলাকার নিহাভান্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন কাঁচের ব্যবসায়ী। তিনি তার চাচা সারি আল সাকাতির কাছেই মানুষ হন। সারি আল সাকাতি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে একজন উন্নত মানুষ বানানোর চেষ্টা করেন। জুনায়েদের বয়স যখন মাত্র ১১ বছর, তখন চাচা সারি আল সাকাতি তাকে নিয়ে হজ্জে গমন করেন। সেবার মসজিদুল হারামে তারা প্রায় চারশত জ্ঞানী আলেমের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই আলেমরা সবাই মিলে কৃতজ্ঞতা তথা শুকরিয়া আদায় করার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বালক জুনায়েদ আর তার চাচা নীরবে সেই আলোচনাগুলো শুনছিলেন।

প্রত্যেক আলেমই নিজের মতকে অন্যদের মতের তুলনায় বেশি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করছিলেন। চাচা সারি আল সাকাতি এই আলোচনায় তার ভ্রাতুষ্পুত্র জুনায়েদকে নিয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন, জুনায়েদ তার বয়সের অন্য যে কারও তুলনায় অনেক বেশি মেধাবী ও জ্ঞানী। তাছাড়া, এতো সব আলোচনার মাঝখানে এই বিষয় নিয়ে জুনায়েদ কি ভাবছে, তা জানারও আগ্রহ ছিল চাচা সারি আল সাকাতির। তাই তিনি গলা একটু ঝেড়ে কাশি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সবাই তার দিকে তাকালে চাচা সারি আল সাকাতি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা সবাই অনেক মূল্যবান মতামত

দিয়েছেন। সবার মতামতই বেশ প্রশংসনীয়। তবে আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা দয়া করে আমার ভাতিজার কথা একটু শুনেন। তার বয়স কম হলেও মাঝে মাঝে সে এমন মন্তব্য করে বসে যে আমি রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যাই। তো বাবা জুনায়েদ, "তুমি কি মনে কর? সত্যিকারের কৃতজ্ঞতাবোধ কি?"

ঐ বৈঠকে যতজন আলেম ছিলেন, তারা সবাই চাচার কর্মকাণ্ডে বেশ অবাক হলেন। তারপরও তারা সেই ছোট্ট জুনায়েদের দিকে তাকালেন এবং তাকে তার মতামত প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ দিলেন। জুনায়েদ অবশ্য এই পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে না গিয়ে বেশ ভালোভাবেই সামাল দিয়েছিল। সে খুব পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, "কৃতজ্ঞতাবোধ বলতে আমি যা বুঝি তাহলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, আমরা তার অপব্যবহার করব না। এই নেয়ামত পাওয়ার পর আমরা আবার নাফরমানিতে ডুবে যাব না। আল্লাহর প্রতি অবাধ্য হবো না। সব সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।"

উপস্থিত সকল বিজ্ঞ আলেম এই অল্পবয়স্ক ছেলেটির পরিণত উত্তরে অবাক হয়ে গেলেন। চাচা সারি আল সাকাতি বেশ প্রশান্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আর বললেন, "জুনায়েদ, আমার মনে হয় তোমাকে আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত বেশি দিয়েছেন তাহলো তোমার জিহবা, তোমার কথা বলার ক্ষমতা আর অদ্ভুত সুন্দর বাচনভঙ্গি।"

এই ঘটনার অনেক বছর পরের কথা। জুনায়েদ তখন বাগদাদে বসবাস করেন। জুনায়েদের তখন অনেক শিষ্যও হয়ে গেছে। তারা সবাই তার কাছ থেকে নতুন কিছু শিখতে এসেছে। জুনায়েদ ততদিনে নিজের সততা, অনুধাবন ক্ষমতা এবং একনিষ্ঠতার জন্য বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন। অনেকে আগে থেকেই শুধুমাত্র জুনায়েদের বক্তব্য শোনার জন্য, আবার যারা তার প্রতি একান্তই অনুগত, তারা তার আবাসস্থলে নিয়মিত থাকতে শুরু করেন। আগত সবার প্রতিই জুনায়েদ ছিলেন সমান দরদি এবং তাদের সবাইকে তিনি একইভাবে শিক্ষা দিতেন। তবে একজন শিষ্য ছিল, যাকে তিনি অন্য সবার চেয়ে

একটু আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতেন। কিন্তু অন্যরা বুঝতে না কেন তিনি ঐ শিষ্যটাকে এতোটা ভালোবাসতেন। তাদের অনেকেই এই শিষ্যকে হিংসা করতে শুরু করেছিল।

একদিন তারা সিদ্ধান্ত নিল ওস্তাদ জুনায়েদকেই তারা সরাসরি প্রশ্ন করবে কেন তিনি ঐ শিষ্যকে একটু বেশিই ভালোবাসেন। তারা জুনায়েদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ও তো আমাদের সবার মতোই। আমরা ওর মধ্যে আলাদা কিছু দেখতে পাই না। তাহলে আপনি কেন অন্য সবার চেয়ে ওকে একটু বেশি গুরুত্ব দেন?"

জুনায়েদ বললেন, "সে তোমাদের চেয়ে বেশি গুছানো, তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানীও বটে। তার ব্যবহারও বেশ উত্তম। সে আল্লাহর প্রতি অনুগত এবং সর্বোপরি সে সমঝদার একটি ছেলে। তোমরা নিজেরাই একদিন বিষয়টা বুঝতে পারবে।"

জুনায়েদ উত্তর দিলেন ঠিকই, তবে তার উত্তরে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারল না। জুনায়েদ যে মন্তব্যগুলো করেছে তার কোনোটারই সত্যতা তারা খুঁজে পেল না। যেহেতু তারা ওস্তাদ জুনায়েদকে খুব সম্মান করে তাই তারা বিষয়টা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য না করে বরং নীরব হয়ে গেল। জুনায়েদও বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন প্রশ্নকারীরা তার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি। তিনি তাদের সামনে সত্যটাকে প্রমাণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরের দিন সকালে জুনায়েদ তার সকল শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে উপস্থিত হলো। তারা ছিল বিশ জন। এবার জুনায়েদ তাদেরকে বললেন, "তোমরা সবাই পাখির বাজারে যাও এবং প্রত্যেকে ১টি করে ২০টি পাখি নিয়ে এসো।" শিষ্যরা ওস্তাদের কথামতো বাজার থেকে ২০টি পাখি কিনে নিয়ে এলো।

এবার জুনায়েদ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি চাই প্রথমে তোমরা এমন একটি স্থানে যাও যেখানে কেউ তোমাদের দেখতে পাবে না। তারপর ছুরি নিয়ে যার যার হাতে থাকা পাখি কুরবানী করবে। এরপর সেই পাখি নিয়ে আবার এখানে আসবে। কিন্তু মনে রাখবে, এই ঘটনা যেন কেউ দেখতে বা জানতে না পারে।"

ওস্তাদের কথা অনুযায়ী, প্রত্যেক শিষ্যই একটি করে পাখি নিয়ে চলে গেল এবং অল্প কিছু সময় পরই তারা ফিরে এলো এবং নিজেদের কুরবানী করা পাখি প্রদর্শন করল। ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ ঘরের পেছন থেকে একটি পাখির চিৎকার আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ভেসে আসলো। দেখা গেল, ওস্তাদ জুনায়েদের সেই প্রিয় শিষ্য একটি জীবন্ত পাখি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার জন্য বরাদ্দকৃত পাখি কুরবানী দিতে পারেনি। উল্টো তার চোখে মুখে বিস্ময়, কেন সবাই তাকে নিয়ে এতো হাসাহাসি করছে!!

অন্য সব সহপাঠীরা তখন টিটকারী মারা শুরু করে দিয়েছে। উপহাস করে তারা বলছে, "উনি জ্ঞানী শিষ্য তো, তাই তার কাজ কর্ম একটু আলাদা। এতোটাই আলাদা যে সে এখন ওস্তাদের হুকুমও অমান্য করা শুরু করে দিয়েছে।"

জুনায়েদ নিজেও বিষয়টার সুরাহা করতে চাইলেন। তিনি সেই জ্ঞানী শিষ্যকে কাছে ডাকলেন এবং প্রশ্ন করলেন, "তুমি কেন পাখিটাকে আমার আদেশ মতো কুরবানী করনি?"

এবার সেই শিষ্য উত্তর দিল, "আপনি আমাকে এমন একটি স্থানে পাখি কুরবানী করতে বলেছিলেন, যেখানে কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ তো সবই দেখতে পান। আমি কিভাবে তার কাছ থেকে লুকিয়ে বা আড়াল করে কিছু করব? তাই আমি পাখি কুরবানী করতে পারিনি।"

জুনায়েদ তার উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন এবং অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এখন বুঝলে তো, কেন এই শিষ্যকে আমি তোমাদের সবার চেয়ে আলাদা করে দেখি, কেন আমি তাকে জ্ঞানী বলি। তোমরা নিজেদের কার্যক্রমের সাথে ওর আচরণকে মিলিয়ে দেখলেই পার্থক্যটা বুঝে যাবে।"

সব শিষ্যরা এবার নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। তারা ওস্তাদ জুনায়েদের কাছে ক্ষমা চাইল এবং অহেতুক জ্ঞানী ঐ শিষ্যকে হিংসা করার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

আবু হুরায়রা (রা) আর জনৈক বন্দির গল্প

রাসূল (সা:) এর প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা) নিজেই এই গল্পটা এভাবে বর্ণনা করেন:

"একবার রাসূল (সা) আমাকে যাকাতের মজুদ পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একদিন নীরবে একজন ব্যক্তি এসে চুপিসারে যাকাতের মজুদ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি লোকটিকে ধরে ফেলি। আমি এই ঘটনায় খুব মন খারাপও করেছিলাম। কে সেই মানুষ যে কি না যাকাতের তহবিল থেকেও চুরি করে। যাকাতের সবকিছু তো অভাবী আর মজলুমদের জন্যই। সেখান থেকে আবার চুরি কেন করতে হবে?

আমি লোকটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করতে চাইলাম। তাকে বললাম, "তুমি যাকাতের মজুদ থেকে চুরি করেছ। তোমাকে আমি

রাসূলের (সা) কাছে নিয়ে যাব। তিনি যা করার করবেন।"

সে কাচুমাচু হয়ে উত্তর দিল, "না, দয়া করে তেমনটা করবেন না। আমি খুব অভাবী একজন মানুষ। আমাকে অনেক বড় পরিবার টানতে হয়। তাই বাধ্য হয়েই আমি চুরি করতে এসেছি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।"

আমি লোকটাকে নিয়ে কিছুটা সময় ভাবলাম। আমার কেমন যেন মায়া হলো। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

পরের দিন সকালে নবিজির (সা) সাথে যখন আমার দেখা হলো, তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "হে আবু হুরায়রা, তোমার বন্দি কাল রাতে শেষ পর্যন্ত কি করল?"

আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। রাসূল (সা) কিভাবে ঘটনাটা জানলেন? তাকে তো আমি কিছু জানাইনি। তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোনো বার্তা দিয়েছেন। যাহোক, এসব ভাবতে ভাবতেই আমি তাকে সব জানালাম। বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, চোরটি আমাকে বলল, তার অনেক বড় পরিবার, অভাবের কারণে সে বাধ্য হয়ে চুরি করেছে। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

রাসূল (সা) বললেন, "আবু হুরায়রা, ও তোমাকে মিথ্যা বলেছে। ও আবার চুরি করতে আসবে।"

আমি সাথে সাথেই বুঝলাম সেই চোরের সাথে আমার আবার দেখা হবে। কেননা রাসূল (সা) কখনো ভুল বা মিথ্যা কিছু বলেন না। তাই পরের দিন রাতে আমি আরো বেশি সতর্ক হয়ে সেই চোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি এবার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আরেকবার দেখতে পেলে লোকটাকে আমি আটক করবই। সে অভাবীদের জন্য বরাদ্দ খাবার থেকে বারবার চুরি করবে- এটা মেনে নেয়া যায় না।

যথারীতি সে এলো এবং আমি আবারও তাকে হাতেনাতে ধরে ফেললাম। আমি বললাম, "আজ তো আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলের (সা) কাছে নিয়ে যাব। সে ভয়ে কেঁদে ফেলল আর বলল, "আমাকে ছেড়ে দিন, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব হতদরিদ্র একজন

মানুষ। আমার পরিবারও বড়। বাধ্য হয়ে আমাকে চুরি করতে হয়। আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আর চুরি করব না।"

তার চোখে এতো পানি ছিল যে আমার আবার কেমন যেন মায়া হলো লোকটার উপর। আমি আবারও তাকে ছেড়ে দিলাম।

ভোর বেলায় নবিজির (সা) সাথে আবার আমার দেখা হলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, "হে আবু হুরায়রা, তোমার বন্দি কাল রাতে কি করেছে?"

আমি উত্তর দিলাম, "হে রাসূলুল্লাহ (সা), সে আবারও তার অভাব-অনটন এবং পরিবারের বোঝার ইস্যুটিকে সামনে এনেছে। আমার তার প্রতি খুব মায়া হয়েছিল তাই আবারও তাকে ছেড়ে দিয়েছি।"

রাসূল (সা) বললেন, "সে আবারও তোমাকে মিথ্যা বলেছে। ও আবারও আসবে।"

রাসূল (সা) এ কথা বলায় তৃতীয় দিন আমি সর্বোচ্চ সতর্ক হয়ে চোরটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। এবার আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আবার আসলে তাকে আমি গ্রেফতার করবই। কারণ সে বার বার আমাকে মিথ্যা বলছে। যা হোক, তৃতীয় বারের মতো সে এলো এবং গোপনে খাবার চুরি করতে শুরু করল। আমি এবারও তাকে ধরে ফেললাম আর বললাম,"এবার তোমাকে রাসূলের (সা) কাছে নিতেই হবে। এটাই তোমার শেষ সুযোগ। তুমি ওয়াদা দিয়েছিলে যে আর আসবে না কিন্তু আবার এসেছো। এবার তুমি যা-ই বল, আমি আর তোমাকে ছাড়বো না।" সেই চোরটি উত্তর দিল,"দয়া করে আমাকে যেতে দিন। আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে যদি আপনি এবার ছেড়ে দেন, তাহলে আমি আপনাকে এমন একটা দোয়ার কথা বলব, যা পাঠ করলে আল্লাহ আপনাকে অনেক সওয়াব দেবেন।"

চোরটির এই কথা শুনে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। আগা গোড়াই নতুন কিছু জানার বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে। তাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই দোয়াটি কি?

সে উত্তর দিল, "আপনি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন (পবিত্র কুরআনের সূরা আল বাকারার ২৫৫ নং

আয়াত)। যে বান্দা ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করেন ফলে শয়তান সকাল অবধি আর সেই বান্দার কাছে আসতে পারে না।"

এটা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরের দিন সকালে রাসূল (সা) আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, "হে আবু হুরায়রা, তোমার বন্দি কাল রাতে তোমার সাথে কি করেছে?"

আমি নবিজিকে (সা) রাতের পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করলাম। আমি জানালাম, চোরটি আমাকে নতুন একটি দোয়া শেখানোর কথা বলায় আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

রাসূল (সা) আবার প্রশ্ন করলেন, "সে তোমাকে কি বলেছে?"

আমি উত্তর দিলাম, লোকটি আমাকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করার জন্য বলেছে। এই আয়াতটি পাঠ করলে আল্লাহ নিজে একজন পাহারাদার নিয়োগ দিয়ে গোটা রাতটি জুড়ে আমাকে হেফাজত করবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান আমার কাছে ভিড়তে পারবে না।

রাসূল (সা) বললেন, "এবার সে তোমাকে সত্য কথা বলেছে। শোন আবু হুরায়রা, যদিও সে বরাবরই মিথ্যাবাদী, তবে এবার এই কথাটি সে সত্য বলেছে।"

রাসূল (সা) আরো বললেন, "হে আবু হুরায়রা, তুমি কি জানো, গত তিন রাত কার সাথে তোমার দেখা হয়েছে?"

আমি বললাম, "না, আমি জানি না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সা) ভালো জানেন।"

রাসূল (সা) বললেন, "সে ছিল ইবলিশ শয়তান।"

(তথ্যসূত্রঃ এই বর্ণনাটি সহীহ আল বুখারীতে পাওয়া যায়। এখানে পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য গোটা ঘটনাটিকে গল্পের আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।)

একমাত্র আল্লাহর জন্য

হযরত মুসার (আ) সময়ে একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তিনি সারা দিন-রাত ইবাদত করতেন। একদিন স্থানীয় কিছু মানুষ এসে তাকে জানাল, পাশের বাগানের একটি গাছকে লোকজন পূজা করতে শুরু করেছে। একথা শুনে ধার্মিক মানুষটি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। সাথে সাথেই তিনি একটি কুড়াল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তার ইচ্ছা কুড়াল দিয়ে গাছটি কেটে ফেলবেন।

ঠিক সেই সময় বয়স্ক এক ব্যক্তির চেহারা নিয়ে ইবলিশ শয়তান ধার্মিক মানুষটির সামনে এলো। শয়তান তাকে বলল, "আপনি কি করতে চান?"

ধার্মিক লোকটি বৃদ্ধলোকরূপী শয়তানকে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি জানালেন এবং বললেন, "আমি ঐ গাছটা কেটে ফেলতে চাই।"

এ কথা শুনে শয়তান বলল, "আপনি কেন শুধু শুধু গাছটা কাটবেন?

আল্লাহ তো আপনাকে এই দায়িত্ব দেননি। আল্লাহ যদি গাছটা কাটাতেই চাইতেন, তাহলে তো তিনি একজন নবিকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন।"

ধার্মিক লোকটা শয়তানকে চিনে ফেললেন। তিনি শয়তানের কথায় কোনোভাবেই থামতে চাননি। তারা দুজন আরো কিছুক্ষণ ঝগড়া করল। একপর্যায়ে তাদের মাঝে রীতিমতো হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। ধার্মিক মানুষটি শয়তানকে মাটির উপর ফেলে দিতে সক্ষম হলেন। এবার তিনি হাতের কুড়াল দিয়ে শয়তানকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তখনই শয়তান ধার্মিক মানুষটির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইল আর বলল, "আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। তাহলে আমি আপনাকে এমন একটি বুদ্ধি দিব যা দুনিয়া ও আখেরাত- উভয় জায়গাতেই আপনার কল্যাণ বয়ে আনবে। আমি আপনাকে প্রতিদিন দুই দিনার করে দিব। আপনি সেখান থেকে এক দিনার গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে পারেন আর বাকি এক দিনার নিজের প্রয়োজন মতো খরচ করবেন। আপাতত এই গাছটি না কেটে আমরা বরং আল্লাহর ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করি।"

শয়তানের এই প্রস্তাবে ধার্মিক লোকটি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি পরামর্শটাকে ভালোই মনে করলেন এবং নীরবে বাড়ি ফিরে গেলেন। দ্বিতীয় দিন ঘুম থেকে উঠে তিনি তার বালিশের নিচে দুই দিনার পেলেন। এই অর্থ পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন এবং ভাবলেন আগের দিনের প্রস্তাব সঠিক ছিল। তার সাথে কেউ প্রতারণা করেনি। তিনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দুই দিনার পেয়ে গেছেন। তিনি এক দিনার গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন আর এক দিনার নিজের কাছে রাখলেন। কিন্তু পরের দিন তিনি ঘুম থেকে উঠে বালিশের নিচে আর ঐ দুই দিনার পেলেন না। তাই তিনি আবারও গাছটি কাটার জন্য কুড়াল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আবারও বৃদ্ধ মানুষরূপী শয়তানের সাথে তার দেখা হলো। শয়তান তাকে প্রশ্ন করল, "আপনি কি করতে যাচ্ছেন?" ধার্মিক মানুষটি উত্তর দিলেন, "আজ আমি গাছ কাটবই।" শয়তান আগের বারের মতো

এবারও তাকে বলল, "আল্লাহ আপনাকে এই গাছটি কাটার দায়িত্ব দেননি। আপনি বরং বাসাতে চলে যান।" ধার্মিক লোকটি একমত হলো না। তিনি আবারও শয়তানের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হলেন। কিন্তু এবার শয়তান তাকে পরাস্ত করে ফেলল।

শয়তানের কাছে এভাবে হেরে যাওয়ায় ধার্মিক লোকটি বেশ অবাক হলেন। তিনি শয়তানকেই প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা ঐদিন আমি তোমাকে হারাতে পারলাম, আজ কেন পারলাম না?" শয়তান উত্তরে বলল, "কেউ যদি নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো ভালো কাজ করে তাহলে তাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু যদি কেউ দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে বা পার্থিব কোনো ফায়দা হাসিলের জন্য কোনো ভালো কাজ করে তাহলে তার শক্তি কমে যায় এবং সে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।"

কেন এই ধার্মিক মানুষটি প্রথম দিন শয়তানের সাথে লড়াইয়ে বিজয়ী হলো কিন্তু দ্বিতীয় দিন এভাবে হেরে গেল? এর কারণ হলো প্রথম দিন এই ধার্মিক লোকটির উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গাছটি কেটে ফেলা, আর কিছু নয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিন তার নিয়ত পাল্টে যায়। সেদিন তিনি বের হয়েছিলেন বাড়তি কিছু দিনার পাওয়ার লোভে। তাই নিজের ভেতর তিনি প্রথম দিন যে আধ্যাত্মিক শক্তিটুকু অনুভব করেছিলেন, দ্বিতীয় দিন গিয়ে তিনি আর তা পাননি।

নিয়তের শুদ্ধতা এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করা খুব জরুরি। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন এতোটা আন্তরিকতা ও সততার সাথে কাজ করতে পারেনা। প্রদর্শন করার ইচ্ছা এবং দুনিয়াবি সুযোগ সুবিধাই আমাদের অনেকের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। তবে এখনো যদি খুলুসিয়াতের সাথে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করা যায় তাহলে বরকত যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি সফলতাও অনেকখানি নিশ্চিত হয়ে যাবে।

আফ্রিকা জয়ী জাফর আত তাইয়্যার (রা)

রাসূল (সা) যখন মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন মক্কার তৎকালীন নেতারা তার বিরুদ্ধে ভীষণভাবে উঠে পড়ে লাগলো। তারা তাঁর সম্পর্কে নানা ধরনের আজেবাজে প্রচারণা চালাল। তারা বলে বেড়ালো, "মুহাম্মাদ একজন পাগল, সে একজন ভালো জাদুকর। জাদুটোনা দিয়েই সে মানুষকে ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" পাশাপাশি মক্কার নেতারা নবি মুহাম্মাদকে (সা) ঘুষ বা লোভনীয় নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে ইসলামের দাওয়াতি কাজ থেকে বিরত রাখারও চেষ্টা করল।

কিন্তু কোনো কিছু করেই যখন তাকে থামানো গেল না, তখন নিজেদের এতো দিনের তৈরি করা সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো না ভেঙ্গে পড়ে- এই আশঙ্কায় মক্কার জালেম কর্তৃপক্ষ নবিজির (সা) উপর

নানাভাবে অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করল। বিশেষ করে যারা সে সময় রাসূলের (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করত, তাদের উপর জুলুমের মাত্রা ছিল অবর্ণনীয়।

কঠিন এই সময়গুলোতে রাসূল (সা) তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচা আবু তালিবের কাছ থেকে যথেষ্ট নিরাপত্তা, আশ্রয় ও সমর্থন পেয়েছিলেন। আবু তালিব সবসময় চেষ্টা করতেন তার ভাতিজার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সব ধরনের বিপদ ও আশঙ্কা থেকে তিনি নবি মুহাম্মাদকে (সা) রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। আবু তালিবের সব সন্তানই একে একে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আগে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। এরপর আবু তালিবের বড় ছেলে জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর আরেক ছেলে আকিল ইবনে আবু তালিবও (রা) ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে কবুল করে নেন।

কাফেরদের অত্যাচার খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে সীমা ছাড়িয়ে গেল। পরিস্থিতি এতোটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠল যে, মক্কায় বসবাস করাই যেন অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন বাস্তবতার প্রয়োজনে রাসূল (সা) এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবিকে লোহিত সাগরের অপর পারের দেশ আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। তার এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কিছু সাহাবির জীবন যেমন রক্ষা পেল ঠিক তেমনি ভিন্ন আরেকটি দেশে ইসলামের সুমহান বার্তা পৌঁছে যাওয়ার একটি সুযোগও তৈরি হলো।

এই কঠিন কাজটি সম্পাদন করার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা) ভরসা রাখলেন তার চাচাতো ভাই এবং আবু তালিবের সন্তান হযরত জাফর বিন আবু তালিবের (রা) উপর। হযরত জাফর (রা) রাসূলের (সা) হুকুমের আনুগত্য করলেন শতভাগ নিষ্ঠার সাথে। তিনি বেশ কিছু সংখ্যক পুরুষ ও নারী সাহাবিকে নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়ায় পৌঁছলেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হিজরতের ঘটনা এটাই। রাসূলের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির ৫ বছরের মাথায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা ঘটে। সাহাবিদের এই দলে ৮২ জন

পুরুষ ও ৮০ জন নারী সাহাবি শামিল ছিলেন।

আবিসিনিয়ায় পৌঁছে হযরত জাফর (রা) ও তার সঙ্গীরা আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। নাজ্জাশী হযরত জাফরের (রা) জ্ঞান, আচার-আচরণ, ব্যবহার ও বিনয়ে ভীষণভাবে বিমোহিত হন। ফলশ্রুতিতে হযরত জাফর (রা) এবং তার নেতৃত্বে থাকা মুহাজির সাহাবিদের আবিসিনিয়ায় সম্মানের সাথেই বরণ করে নেয়।

কিন্তু কাফেররা তো মুসলমানদের এতো সহজে ছেড়ে দিতে পারে না। মুসলামানরা আবিসিনয়ায় ভালো সম্বর্ধনা পেয়েছে এই সংবাদটি পেয়ে তারাও মুসলমানদের পিছু পিছু আবিসিনিয়ায় চলে গেল। কুরাইশদের প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ বিন রাবিহ এবং আমর বিন আসের নেতৃত্বে বেশ কিছু কুরাইশ সদস্য দামি দামি সব উপহার নিয়ে নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে হাজির হলো। দরবারে প্রবেশ করেই কুরাইশরা নাজ্জাশীর সামনে সিজদায় অবনত হলো এবং রাজার জন্য নিয়ে আসা সব উপহার তার সামনে উপস্থাপন করল।

কুরাইশরা বলল, "আমাদের দেশে হঠাৎ করেই একজন মানুষ নতুন একটি ধর্মের প্রচার শুরু করেছে। তার ডাকে কিছু মানুষ সাড়াও দিয়েছে। আমরা তাদেরকে বিরত রাখার এবং প্রতিহত করার সব চেষ্টাই করেছি। এরই মধ্যে, নতুন ধর্মগ্রহণকারীদের কয়েকজন আবার এসে আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি তাদের বের করে দিন নতুবা আমাদের হাতে তাদেরকে ছেড়ে দিন।"

রাজা নাজ্জাশী উত্তরে বললেন, "আমি ইতোমধ্যে তাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়েছি। তাই এখনি তাদেরকে বের করে দেয়া সম্ভব নয়।" এরপর তিনি তার দরবারে আগত মুসলমান সাহাবিদের ডেকে পাঠালেন।

হযরত জাফর (রা) বেশ কয়েকজন সাহাবি নিয়ে রাজা নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি একবারের জন্যও নাজ্জাশীর সামনে সিজদা দিলেন না। দরবারে উপস্থিত অন্য সবাই তখন হযরত জাফর

(রা) ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে ভর্ৎসনা করল। তারা জানালেন রাজাকে সিজদা না করে তাঁরা অন্যায় করেছেন। কিন্তু হযরত জাফর (রা) তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে সাহসিকতার সাথে বললেন, "আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করি না। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করি না।"

রাজা নাজ্জাশী ছিলেন একজন ধার্মিক খ্রিষ্টান। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, ঐশ্বরিক কোনো ধর্মেই মানুষকে সিজদা দেয়ার বিধান নেই। তিনি অন্যদের মতো রেগে না গিয়ে বরং হযরত জাফরকে (রা) তার পাশের আসনে বসতে বললেন। তিনি কুরাইশদের দেখিয়ে হযরত জাফরকে (রা) উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই মানুষগুলো আপনাদের নিজেদের দেশ থেকেই এসেছে। তারা আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, আপনারা নাকি বাপ-দাদার পুরনো ধর্ম ছেড়ে, সব ধরনের মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে নতুন এক স্রষ্টার ইবাদত শুরু করেছেন?"

হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা) খুব বলিষ্ঠভাবে উত্তর দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, "হে বাদশাহ নাজ্জাশী, আমরা এতোদিন গভীর অন্ধকার আর অজ্ঞতার চোরাবালিতে ডুবে ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, বেহায়াপনা ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমরা মৃত প্রাণীর গোশত খেতাম। আমরা আমাদের প্রতিবেশির হক নষ্ট করতাম। ঠিক এমনই এক সময়ে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে একজন মানুষকে পাঠালেন যিনি বিশুদ্ধ, সৎ এবং বিশ্বস্ত চরিত্রের অধিকারী। তিনি আমাদের এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানালেন। বললেন, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। তিনি আমাদের মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করলেন। সবসময় সত্য কথা বলার আদেশ দিলেন, অন্য সবার আমানত ও বিশ্বাস হেফাজত করার শিক্ষা দিলেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিবেশি ও আত্মীয়দের প্রতি দরদী হওয়ার আহ্বান জানালেন। তিনি নারীদের নিয়ে কটু ও অশ্লীল কথা বলা নিষিদ্ধ করলেন। সব ধরনের পাপ থেকে দূরে থাকার অনুরোধ করলেন, নিয়মিত ইবাদত করার তাগিদ দিলেন। দান-সাদকা

বাড়ানোর পরামর্শ দিলেন এবং রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।"

এসব কথা শোনোর পর রাজা নাজ্জাশী হযরত জাফরকে (রা) পবিত্র কুরআন থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত করতে বললেন। জাফর (রা) বিসমিল্লাহ বলে সূরা মারিয়ামের বেশ কয়েকটি আয়াত পড়ে শোনালেন। তার সুমিষ্ট কণ্ঠের তেলাওয়াত নাজ্জাশীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারায় পানি ঝরতে লাগল। সূরা মারিয়ামের ঐ আয়াতগুলোতে যখন হযরত ঈসাকে (আ) নিয়ে কিছু কথা বলা হলো, তখন খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী নাজ্জাশী বুঝতে পারলেন যে, হযরত জাফর (রা) যে ধর্মের কথা বলছেন তা ই আসলে সত্য ধর্ম। কারণ কুরআনে যা বলা হয়েছে, তার সাথে পূর্বে নাজিল হওয়া আসমানি কিতাব তাওরাত ও ইনজিলের (বাইবেল) ব্যাপক মিল রয়েছে। নাজ্জাশী একজন ধার্মিক খ্রিষ্টান হওয়ায় আগে থেকেই বিষয়গুলো জানতেন। তিনি সঠিক বিষয়টি যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

তিনি কুরাইশদের আবেদন খারিজ করে দেন এবং আমর বিন আসকে বলেন যাতে তারা তাদের উপহারগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আমর বিন আস দরবার ত্যাগ করলেন ঠিকই তবে তার মনে তখনো দুষ্টু বুদ্ধি খেলা করছিল। তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন যে, খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসাকে (যিশু) আল্লাহর ছেলে মনে করলেও মুসলমানরা তা করে না। তাই এই বিষয়টি যদি নাজ্জাশীর সামনে প্রমাণ করা যায় তাহলে হয়তো তিনি মুসলমানদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিবেন।

সেই ভাবনা থেকেই আমর বিন আস পরের দিন আবার নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি নাজ্জাশীকে অনুরোধ করলেন, যাতে তিনি মুসলমানদের প্রশ্ন করেন তারা হযরত ঈসাকে (আ) কিভাবে বিবেচনা করে।

নাজ্জাশী আবারও মুসলমানদের ডেকে পাঠালেন। হযরত জাফরের (রা) নেতৃত্বে মুসলমানরা এসে পৌছলে তাদেরকে আবারও দরবারে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হয়। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে নাজ্জাশী

এবার হযরত জাফরকে (রা) প্রশ্ন করলেন, "হযরত ঈসাকে (আ) নিয়ে আপনাদের নবি মুহাম্মাদ (সা) কি মন্তব্য করেছেন? তার ব্যাপারে আপনাদের মূল্যায়নই বা কী?"

সঙ্গে থাকা মুসলমানরা রাজার এই প্রশ্নে বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তারা ভাবলেন জাফর (রা) যদি সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারেন তাহলে হয়তো নাজ্জাশী তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে আবার কাফেরদের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু হযরত জাফর (রা) ছিলেন খুবই ধৈর্য্যশীল ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের মানুষ। তিনি নাজ্জাশীর সামনে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন। এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং তাঁরই কাছ থেকে আগত রূহ । অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রাসূলগণকে মান্য কর।"

এ আয়াত পাঠ করায় নাজ্জাশী খুব খুশি হলেন। সন্তুষ্টচিত্তে তিনি বললেন, "আমাদের মূল যে ধর্মগ্রন্থ ইনজিল, তাতেও ঠিক এরকমই বলা আছে।" এরপর তিনি আমর বিন আস ও তার কুরাইশ সঙ্গীদের আবিসিনিয়া থেকে বহিষ্কার করেন। শুধু তাই নয়, তখন থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি নাজ্জাশীর আস্থা ও ভালোবাসা বহুগুণে বেড়ে যায়।

এভাবেই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা) ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলেন। রাসূল (সা) মদিনায় হিজরতের পর তিনি মদিনায় চলে আসেন। তবে মদিনায় আসার পূর্বে দীর্ঘ ১৫ বছর তিনি গোটা আবিসিনিয়ায় ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেন।

প্রশান্ত আত্মার অধিকারী একজন মানুষ

আবু জার ছিলেন গিফার গোত্রের একজন সদস্য। তিনি প্রায়শই ওয়াদ্দান উপত্যকার উপর দাঁড়িয়ে মক্কা থেকে আসা বণিক দল ও মুসাফিরদের প্রতি নজর রাখতেন। এভাবে বণিক আর মুসাফিরদের যাওয়া-আসা দেখাটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর মুহূর্ত। গিফার গোত্রের বসবাস ছিল ওয়াদ্দান উপত্যকায়। সেখানে পানির সরবরাহ ব্যবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। উট বা ঘোড়া চরানোর মতো অবকাঠামোগত সুবিধাও তেমন একটা ছিল না। তারপরও মক্কার ভ্রমণকারী মরুযাত্রীদলকে তাদের মূল্যবান সব সম্পদসহ এই এলাকা দিয়েই পার হতে হতো।

আবু জার তার গোত্রের আরো কিছু যুবকদের নিয়ে মক্কাগামী এসব বণিকদলের যাওয়া-আসার সময় টাকা আদায় করতেন। অনেকটা আজকের সময়ের চাঁদাবাজির মতো। মক্কায় যাওয়া-আসার পথে

প্রতিটি বণিকদলকেই এই ওয়াদ্দান উপত্যকার যুবকদের কিছু না কিছু অর্থ দিয়ে আসতে হতো। আর সেই অর্থ দিয়েই গোটা গিফার গোত্রের মানুষগুলো জীবনযাপন করত। যদি বণিকেরা সেই অর্থ স্বেচ্ছায় না প্রদান করত, তাহলে জোর করেই তা আদায় করা হতো। আর যেসব বণিকেরা গিফারদের চাহিদামতো অর্থ দিত, তাদেরকে আবু জার নিরাপত্তা দেয়ার চেষ্টা করতেন। আবু জার ও তার দলের অন্যান্য সদস্যরা সারারাত জেগে সেই বণিক দলকে পাহারা দিতেন। এই নিরাপত্তা সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন হতো যে, এই সব বণিক ও মুসাফিরদের সাথে আবু জার ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেই পার করে দিতেন। তাদের সাথে বসে একই খাবার খেতেন। পাশাপাশি, এসব বণিকেরা দূরবর্তী রোমান ও সাসানিদ সাম্রাজ্যের যেসব জায়গায় নিয়মিত গমন করতো, সেই এলাকাগুলোর সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধেও আবু জার নিয়মিতভাবে জানার চেষ্টা করতেন।

এরকমই এক যাত্রীদলকে আবু জার ও তার সঙ্গীরা ওয়াদ্দান উপত্যকায় নিরাপত্তা সেবা প্রদান করছিলেন। নানা বিষয়ে তাদের সাথে কথাও হচ্ছিল। আবু জার বরাবরের মতই তাদের কাছ থেকে রোমান বা সাসানিদ সাম্রাজ্যের তথ্য জানতে চাইছিলেন। কিন্তু বণিক দলের সাথে কথা বলে জানা গেল, রোমান বা সাসানিদে নয়, বরং বড় আকারের ঘটনা ঘটে গেছে মক্কায়। মক্কা ছিল তৎকালীন সময়ের সকল বণিকদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় তীর্থস্থান। আরবের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের কাছেও মক্কা ছিল ধর্মীয় আচারাদি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। মক্কায় নতুন কিছু হয়েছে বা হচ্ছে- এই বিষয়টি নিয়ে সকলেরই আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। বণিকদলের কাছ থেকে মক্কা সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য জানার পর আবু জার নিজেও মক্কার সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জানার জন্য অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বণিক দলের লোকেরা বলাবলি করছিল, "মক্কার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। এই শহরের সামনে কি হাল হয় কে জানে!! কোথা থেকে হঠাৎ করে একজন বিদ্রোহী যুবকের আবির্ভাব ঘটেছে যে কিনা কাবার সব মূর্তিকে ধ্বংস করতে চায়। সে

বলছে, এসব মূর্তিপূজা করা যাবে না। ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহর। তার এই নতুন ধর্মে অনেকেই দিক্ষিত হয়েছে। ফলে মক্কার অনেক পরিবারেই বাবা সন্তানের বিরুদ্ধে না হলে সন্তান বাবার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। গোটা শহরে অশান্তি ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।"

সেদিন এতোটুকু কথাবার্তা হওয়ার পরই ঐ বণিকদলটি ওয়াদ্দান উপত্যকা ছেড়ে চলে যায়। সন্ধ্যার পর আরেকটি বণিকদল এসে পৌঁছায়। তারা সবেমাত্র মক্কা ছেড়ে এসেছে। আবু জার তাদের কাছে মক্কার ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা ফিসফিস করে তাকে জানায়, "নতুন যে মানুষটিকে নিয়ে এতো কথা হচ্ছে সে কোনো সাধারণ মানুষ নয়। সে মক্কার সবচেয়ে কর্তৃত্বশালী কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রে জন্ম নিয়েছে। তার নাম মুহাম্মাদ (সা)। তিনি দাবি করছেন যে, আল্লাহ নিজেই নাকি ফেরেশতার মাধ্যমে তার কাছে ওহি প্রেরণ করেন। তিনি সব ধরনের মূর্তিপূজার পথ ত্যাগ করে মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের কাছে অবশ্য লোকটাকে খারাপ মনে হয়নি। যদিও বিভিন্ন গোত্রের প্রধান ব্যক্তিরা এবং মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মুহাম্মাদকে (সা) পাগল মনে করছেন। কিন্তু প্রতিদিনই নতুন করে অসংখ্য মানুষ নতুন এই ধর্ম গ্রহণ করছে। আর এদের অধিকাংশই যুবক ও দরিদ্র। যারা নতুন ধর্ম গ্রহণ করছে, তারা এতোটাই আন্তরিক ও বিশ্বস্ত আর হযরত মুহাম্মাদকে (সা) তারা এতোটাই ভালোবাসেন যে তারা কোনো অত্যাচার বা সংকটকেই ভয় পাচ্ছে না।"

আবু জার এই বর্ণনাগুলো শুনে খুবই অবাক হলেন। একজন মানুষ এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য যে কোনো ঝুঁকি নিতে পরোয়া করছে না- এই বিষয়টায় তিনি রীতিমতো বিস্মিত হয়ে পড়লেন। তিনি তারপর প্রতিটি সময় শুধু এই শোনা কথাগুলো নিয়েই ভাবতে শুরু করলেন। এমনকি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এগুলোই ভাবতেন। রাতে অনেক সময় তার ঘুম নানা কারণে ভেঙ্গে গেলে তিনি আবার এগুলো নিয়ে চিন্তা করতেন। এক আল্লাহর ইবাদত করা কিংবা এতোদিন ধরে তারা যে মূর্তি ও দেবতাদের পূজা করছিলেন তাদেরকে

বর্জন করার বিষয়টাও তাকে বেশ ভাবাচ্ছিল। আবু জার বার বার ভাবছিলেন যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও শক্তি কোন পর্যায়ে গেলে একজন মানুষ তার গোটা গোত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে?

তিনি আরো অনেক কিছু নিয়েই চিন্তা করতে থাকলেন। যদি আসলেই শুধুমাত্র যুবক আর গরীব লোকেরা মুহাম্মাদের (সা) সাথে থাকে, তাহলে এদের দিয়ে তো তিনি কিছুই করতে পারবেন না। যারা নেতৃত্বস্থানীয় তারা যদি নতুন এই ধর্ম না মানে তাহলে তো ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে নতুন ধর্ম গ্রহণকারীদের বর্জন করে নির্বাসনেও পাঠাতে পারেন। এই মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে কি এমন আছে যে দলে দলে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে? একা একজন মানুষ কিভাবে গোটা একটা সম্প্রদায়ের ঘুম হারাম করে দিতে পারেন? কিন্তু এতো বিস্ময়কর ক্ষমতা ও প্রভাব যার- তার ব্যাপারে তিনি কিভাবে আরো বেশি জানতে পারেন, এসব কিছু নিয়েই আবু জার ভেবে যাচ্ছিলেন।

এসব কথা ভেবে ভেবেই তিনি কোনোমতে রাতটা পার করলেন। ভোর হতেই তিনি তার ভাই আনিসের ঘরে গিয়ে উঁকি মারলেন। তাকে বললেন, "আনিস, শোন, বাস্তবতার কারণে আমি এই মুহূর্তে মক্কা যেতে পারছি না। এখানে আমার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্বও আছে। আমি চাই, আমার হয়ে তুমি মক্কায় যাও। আমাকে জানাও যে, এই মুহাম্মাদ (সা) লোকটি কেমন, তার মূল কথাগুলো কি? তিনি আসলে কি করতে চান? আমি তোমার উপর ভরসা রাখি। তুমি বুদ্ধিমান, চৌকষ এবং কবি। যদি মুহাম্মাদের (সা) কথাগুলো কোনো কবিতা হয়, তাহলে আর কেউ না হলেও তুমি ঠিকই তা বুঝতে পারবে। আর উনি যা তেলাওয়াত করে তা যদি তোমার কাছে ভালো লাগে তাহলে তুমি আমার জন্য এর কিছু অংশ মুখস্থ করে রেখ। তুমি ফিরে আসার পর আমি না হয় তা শুনে নিব।"

আনিস উত্তর দিলেন, "সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও এই ব্যক্তি সমন্ধে জেনে বেশ অবাক হয়েছি। কিভাবে সামান্য একজন মানুষ এতোগুলো গোত্রের এতো বছরের শক্তিশালী ভিতকে এভাবে নাড়িয়ে

দিলেন তা আমাকেও বিস্মিত করেছে। আমি তার কাছে যাব, তুমি যেভাবে বললে, সেভাবেই তথ্য নেয়ার চেষ্টা করব। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সব তথ্য জেনে এবং মক্কার সার্বিক পরিস্থিতি দেখে আমি ফিরে আসব।"

এই বলে অল্প কিছু খেজুর, কিছু শুকনো খাবার আর একটি পাত্রে সামান্য কিছু পানি নিয়ে আনিস মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। এভাবে কয়েক দিন চলে গেল । কিন্তু আবু জারের জন্য এই অল্প কয়েকটি দিন যেন একেকটা বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। তৃতীয় দিন থেকে আবু জার প্রতিদিন উপত্যকার উপর থেকে পথে চোখ রাখতে শুরু করলেন, এই আশায় যে তার ভাইয়ের ফিরে আসার কোনো দৃশ্য দেখা যায় কি না। পরের দুই রাতে উত্তেজনা আর আগ্রহের কারণে তিনি ভালোমতো ঘুমাতেও পারলেন না। শুধু এপাশ ওপাশ করলেন। তার শুধু মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তার ভাইয়ের উটের পায়ের আওয়াজ শোনা যাবে, এই বুঝি তার ভাই ফিরে এলো।

একটা পর্যায়ে আবু জারের আফসোস হলো। তিনি ভাবলেন, "আমার যখন এতো অস্থিরতা, তখন ওকে না পাঠিয়ে বরং সরাসরি আমি গেলেই ভালো হতো। কারণ আমি এতোটাই অস্থির হয়ে আছি যে নিজের কাজগুলোও যথাযথভাবে করতে পারছি না।"

এভাবে এক সপ্তাহ পার হওয়ার পর আনিস মক্কা থেকে ফিরে এলেন। আবু জার ছুটে গিয়ে তার ভাইকে জড়িয়ে ধরলেন। সাথে সাথে তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন, "আনিস, তুমি কি লোকটিকে দেখেছ? তুমি কি তার কোনো কথা শুনেছ? ঐশ্বরিক কোনো আয়াত শুনতে পেয়েছ? তিনি কি বলেন? একক সৃষ্টিকর্তা প্রসঙ্গে তার মূল কথা কি ইত্যাদি।"

আনিস শুধু মৃদু একটা হাসি দিল আর বলল, "ভাই, তোমার অনুরোধে আমি মক্কা গিয়েছিলাম এবং অনেক বড় একটি যাত্রা শেষ করে মাত্র ফিরলাম। আমাকে অন্তত একটু ফ্রেশ হতে দাও। যদি আরেকটু ধৈর্য্য ধরো, তাহলে আমি একটু খেয়েও নিব, কারণ আমার অনেক ক্ষুধা পেয়েছে। তারপর সব বলছি।"

গোসল করে, খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে আনিস বলল, "আমি মুহাম্মাদকে (সা) দেখার সুযোগ পাইনি। তবে তার কিছু কথা (আয়াত) শুনেছি। যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাজিল হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এই সব আয়াত নিয়ে আসেন। তিনি মূলত ওহির বাহকের কাজ করেন। মুহাম্মাদের (সা) মূল কথা হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না। তিনি একমাত্র প্রতিপালক, শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথেই আছেন, তিনি আমাদের সব অবস্থায় দেখতে পান। আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আমাদের আগে পবিত্র হয়ে নিতে হবে। মুহাম্মাদ (সা) সব সময় মানুষকে ভালো কাজ করার পরামর্শ দেন, অভাবীদের সাহায্য করতে বলেন। তিনি মেয়ে শিশুদের জীবন্ত কবর দিতে নিষেধ করেন। সেই সাথে আমাদের সমাজে থাকা বিধবা আর এতিমদের প্রতি তিনি যত্নবান হওয়ার তাগিদ দেন। তিনি এ ধরনের যেসব কথা বলেন, সবই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আয়াত হিসেবে তার উপর নাজিল হয়। এরকম কিছু আয়াত আমি সংগ্রহ করেছি এবং লিখেও এনেছি। আমরা যাকে কবিতা বলি, এই আয়াতগুলো মোটেও তেমন নয়। তবে আমার মতে, আমি আমার জীবনে সবচেয়ে সুন্দর যে কবিতাগুলো পড়েছি, এই আয়াতগুলো তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।"

আবু জার বললেন, "আসলেই কি তাই!! আচ্ছা, মক্কার মানুষেরা এ বিষয়ে কি বলে?"

আনিস উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। প্রকৃতপক্ষেই আয়াতগুলো কবিতার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আর মক্কার মানুষের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। কেউ কেউ তাকে কবি মনে করে। কেউ বা মনে করে জাদুকর। কুরাইশ নেতারা তো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য তাকে রীতিমতো ঘৃণা করে। তবে আমি তোমাকে বলছি, তিনি যা বলেন, তা সাধারণ কোনো কবিতা নয়। তিনি কোনো জাদুকরও নন। তার বক্তব্যে এমন কিছু বিষয় আছে যা আমরা কেউ আগে শুনিনি।"

আবু জার চোখ বড় বড় করে যেন তার ভাইয়ের কথা গিলছিলেন।

তিনি বললেন, "তুমি যা বলছো, তা আমাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারছে না। বরং লোকটার প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল। তার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি মনে হয় স্বস্তি পাব না। আমি বরং মক্কায় চলে যাই। তোমার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আমি যে কয়দিন থাকব না, তুমি আমার পরিবার আর আমার কাজগুলোকে একটু দেখে রেখো।"

আনিস বলল, "তুমি যেহেতু যেতেই চাচ্ছ, তার মানে আমি এই সপ্তাহখানেক সফর করেও তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। যাও তুমি। আমি জানি, তোমার মনের এই অস্থিরতা মক্কায় যাওয়া ছাড়া কমবে না। তোমার ভাগ্য ভালোও হতে পারে। আমি মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে কুরআনের আয়াত সরাসরি শুনতে পারিনি। তুমি হয়তো পারবে। মক্কায় সাবধানে থেক। মুহাম্মাদের (সা) কাছে কেউ গেলে মক্কার কুরাইশরা তা মোটেও ভালোভাবে নেয় না।"

আবু জার মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। অবশেষে যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন, তিনি অনুভব করলেন, মক্কার সর্বত্রই কেমন যেন অস্থিরতা আর উত্তেজনা বিরাজমান। সবাই সবাইকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে, সন্দেহের চোখে দেখছে। নতুন করে কে মুহাম্মাদের (সা) প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করল কিংবা কুরাইশরা সর্বশেষ কাকে নির্যাতন করেছে- এগুলোই আলোচনার বিষয়। একটু একটু পর জটলা করে একদল মানুষ এগুলো নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছিল। এতো কিছুর পরও কিছু মানুষ প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করছিল। সাহস করে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা প্রদান করছিল।

ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কিভাবে একজন সন্তান তার পিতামাতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছিল কিংবা কিভাবে কোনো একজন ক্রীতদাস প্রকাশ্যে তার মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে এক আল্লাহর আনুগত্য করার ঘোষণা দিয়েছিল- এই সব গল্প তখন মানুষের মুখে মুখে। আবু জারও বিভিন্ন স্থানে বসে সেই গল্পগুলোই শুনছিলেন। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনায় হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং তার অনুসারীদের যে ভয়াবহ

নির্যাতনের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল তিনি সেগুলোর বিষয়েও অবগত হচ্ছিলেন।

আবু জার অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে গেলেন যে, মুহাম্মাদের (সা) বিষয়ে কাউকে সরাসরি প্রশ্ন করাটা তার জন্য নিরাপদ নয়। তাহলে তাকেও মুহাম্মাদের (সা) অনুসারী হিসেবে কুরাইশরা ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করতে পারে। আর নতুন ধর্ম গ্রহণ করবেন কি না, তা যেহেতু নিশ্চিত নয়, তাই শুধু শুধু আবু জার কোনো বিড়ম্বনা বা অত্যাচার সহ্য করতে চাননি।

মক্কার একেবারে কেন্দ্রস্থলেই ছিল কাবা। আল্লাহর ঘর। যারা হজ্জে বা তীর্থযাত্রায় মক্কায় আসতো, তাদের মক্কা নগরীতে আশ্রয় দেয়া হতো। আতিথেয়তা প্রদান করা হতো। তাই মক্কায় কয়েক রাত থাকার মতো জায়গার কোনো অভাব ছিল না। তেমনই কোনো একটি জায়গায় আবু জার আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো, পরিবেশটা এতোটাই গুমট ছিল যে, স্বাভাবিকভাবে কোনো ব্যক্তিই যেমন তার সাথে কথা বলতে আসেনি ঠিক তেমনি তিনিও কারও সাথে স্বেচ্ছায় গিয়ে কথা বলার মতো সুযোগ পাননি।

কিছু সময় পর একজন কিশোর তার কাছে এলো। তার গায়ের পোশাকটি ছিল ততটা মানের নয় কিন্তু তার মুখের হাসি ও ব্যবহার এতোটাই আন্তরিক যে মুহূর্তেই আবু জার তাকে ভালোবেসে ফেললেন। কিশোরটি বলল, "হে মুসাফির, আপনাকে স্বাগতম। আপনি নিশ্চয়ই দীর্ঘ সময় ভ্রমণ করে এসেছেন। দয়া করে আমার সাথে এক বেলা খাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আমি আপনার রাতে ঘুমানোর জন্য নিরাপদ আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করব।"

এই কিশোরের প্রস্তাব শুনে আবু জার নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি মক্কায় সরাসরি কাউকে চিনতেন না। আর তিনি এমন এক গোত্রের মানুষ আর এমন সব কাজ করেন যে, মক্কায় তার কোনো বন্ধু থাকারও কথা নয়। তাই তিনি সেই কিশোরটির পিছু পিছুই তার বাসায় চলে গেলেন। যাত্রাপথে তিনি কিশোরটিকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার নাম কি?" ছেলেটি বলল, "আমার নাম আলী।" আবু জার নিজেও তার

পরিচয় দিলেন এবং জানালেন তিনি ওয়াদ্দান উপত্যকার গিফার গোত্রের সদস্য।

আলী আবু জারকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি মুসাফির আবু জারের জন্য সামান্য কিছু খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করলেন। ঘুমের জন্য সুন্দর আয়োজনও করলেন। এই পুরোটা সময়ে আলী একবারও আবু জারকে তার মক্কায় আসার কারণ সমন্ধে কোনো প্রশ্ন করলেন না।

এভাবে আরো একটি দিন চলে যায়। আবু জার আলীর বাসায় এক রাত থেকে আবার শহরের এক সাধারণ মেহমানখানায় উঠে গেলেন। তখনো আবু জার নবি মুহাম্মাদের (সা) নাম কারো মুখে শুনেনি, তার কোনো অনুসারীরও দেখা পাননি। যখন সন্ধ্যা নেমে এলো, তখন আবার কিশোর আলী আবু জারের কাছে এলো। আবারও আলী তার বাসায় যাওয়ার জন্য আবু জারকে দাওয়াত দিলেন।

আবু জারও যথারীতি আগের দিনের মতোই আলীর সাথে তার বাসায় গেলেন এবং টানা দ্বিতীয় রাতও সেই বাড়িতে পার করলেন। তখনো তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে, মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে এই কিশোর ছেলেটিকে কোনো প্রশ্ন করা ঠিক হবে কি না।

পরের দিন, আবু জার এখানে ওখানে কান পাতলেন। মানুষের কথাবার্তা ও আলোচনা শোনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনোভাবেই তিনি মুহাম্মাদের (সা) কাছাকাছি যাওয়ার মতো কোনো রাস্তা বের করতে পারছিলেন না। বিমর্ষ মন নিয়ে তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে তাই কাবার দিকে হাটতে শুরু করলেন। ঠিক সেই সময় আলী এসে আবারও তার বাসায় যাওয়ার দাওয়াত দিল আর আবু জার তৃতীয় বার তার বাসায় চলে গেলেন।

সেই রাতে আলী ও আবু জার একই সাথে রাতের খাবার খেলেন। কিন্তু তারা কেউ তেমন কোনো বাড়তি কথা বললেন না। খাবার খাওয়া শেষে কিশোর আলী মেহমান আবু জারের দিকে হেসে বলল, "আপনি তিনদিন এই বাসায় থেকে তো বুঝেছেন যে, এখানে ভয়ের কিছু নেই। আপনি আমাকে ভরসা করতে পারেন। আপনি কেন এসেছেন বা

আপনার কি প্রয়োজন তা যদি এবার আমাকে একটু বলেন, তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব।"

আবু জার তখনো বেশ অস্বস্তিতে ছিলেন। তিনি উত্তেজনায় অনেকগুলো পানি ঢক ঢক করে গিলে ফেললেন। তারপর প্রচণ্ড জড়তা নিয়ে আলীর কাছে গিয়ে বসলেন। আরো বেশ কিছুটা সময় আবু জার চুপচাপ ভাবলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এভাবে চুপ থেকে আসলে কোনো লাভ নেই। যেহেতু তিনি কোথাও থেকেই কোনো কিছু জানতে পারছেন না। তাই এই কিশোরকে তিনি সামান্য কিছু প্রশ্ন করতেই পারেন। আর বিগত তিনদিনে যেহেতু কিশোরটি তার কোনো ক্ষতি করেনি তাই তাকে বোধ হয় বিশ্বাস করা যায়। এসব ভেবে আবু জার কথা বলার জন্য মনস্থির করলেন।

আবু জার বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে বলব আমি কেন মক্কায় এসেছি। কথা দাও যে বিষয়টা গোপন তুমি রাখবে। আর সম্ভব হলে আমি যে মানুষটির খোঁজে এসেছি তুমি তার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে।"

আলী বললেন, "ঠিক আছে, আমি কথা দিলাম।"

আবু জার এবার বললেন, "আসলে আমি নতুন নবিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। যেই মানুষটি এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলছে, তাকে আমার প্রয়োজন।"

আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আবু জারকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি এমন কিছুই ভেবেছিলাম। আপনার চালচলন দেখে আমার শুরু থেকেই মনে হয়েছিল যে, আপনি সাদামাটা কোনো কারণে আসেননি। অবশ্যই আমি আপনাকে নবির কাছে নিয়ে যাব। আর তিনি নবুওয়াতের দাবি করছেন, বিষয়টা তেমন নয়। তিনি প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।"

হযরত আলীর মুখে ইতিবাচক কথা শুনে আবু জার অনেকখানি স্বস্তি পেলেন।

আলী আরো বললেন, "সকাল বেলা আপনি আমার সাথে যাবেন।

তবে আমি যেভাবে বলব, ঠিক সেভাবে আপনি চলবেন। তা না হলে আপনি আমি দুজনেই বিপদে পড়তে পারি। একটু দূর থেকে আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। আমি যখন হাঁটবো, আপনিও পিছু পিছু হাঁটবেন। আমি থেমে গেলে, আপনিও থেমে যাবেন। বিপদ কেটে গেলে আবার আমরা হাঁটবো। আমি যেদিক দিয়ে বা যে দরজা দিয়ে ঢুকবো, আপনিও আমার পেছনে পেছনে সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবেন।"

আবু জার পুরো নির্দেশনাগুলো ভালোমতো শুনলেন ও নিজের ভেতর গেঁথে নিলেন। তারপর তারা দুজনেই ঘুমাতে চলে গেলেন। কিন্তু আবু জারের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। তার সাথে যা ঘটছে, কিছুই যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। তিনি এতোদিন ধরে যে মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এখন তার সামনে উপস্থিত। মক্কা খুব বড় কোনো শহর নয়। এখানে অল্প কয়েক হাজার মানুষ বসবাস করে। অথচ এখানেও নবির কাছে পৌঁছাবার জন্য তাকে কত চড়াই উতরাই পার হতে হলো। নবিজিকে (সা) শুধু যে নিজ শহরেই নির্বাসনে রাখা হয়েছে তাই নয়, বরং তার চারপাশেও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। তার সম্বন্ধে নানা ধরনের ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রসূত মন্তব্য এবং কুসংস্কার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যাদের সাহস নেই তারা হয়তো নবি পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারবেন না। আবু জার এতো দূর আসতে পেরেছেন কেননা শুরু থেকেই তিনি জানতেন, তিনি কি করতে চান এবং কোথায় গিয়ে তিনি থামবেন।

আবু জারের অস্থিরতা বেড়েই চলল। তার কান দুটো কুরআনের তেলাওয়াত শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেও নবিকে (সা) এক নজর দেখার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। নবির কথা আর কুরআনের বার্তাকে ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য আবু জারের আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। সারা রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না। উত্তেজনায় শুধু ছটফট করে গেলেন। এভাবেই রাত পার হয়ে একসময় ভোর নেমে এলো।

সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই আলী দরজা খুলে বাইরে

বেরিয়ে গেলেন। আবু জারও তার পেছনে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু দূর থেকে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি খুব সতর্ক ছিলেন যাতে অন্য কেউ তাদের এই যাতায়াতটি না দেখে ফেলে কেননা তাতে তাদের দুজনেরই বড় আকারের বিপদ হতে পারে। আবার একই সঙ্গে তিনি আলীকেও চোখে চোখে রাখছিলেন। যাতে কোনোভাবেই আলী চোখের আড়ালে চলে না যায়। তাহলে তার বহুদিনের আকাঙ্খিত মানুষের কাছে যাওয়ার যে সুযোগটি তিনি এতো কষ্ট করে পেয়েছেন সেটাও হয়তো হেলায় হারিয়ে যাবে।

আবু জার কিশোর আলী থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই চলছিলেন। যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে যে তিনি কাউকে অনুসরণ করছেন। অবশেষে তারা সেই কাঙ্খিত স্থানে পৌঁছে গেলেন। এটা একটি সাদামাটা বাড়ি ছিল যেখানে নবি মুহাম্মাদ (সা) অবস্থান করছিলেন। প্রথমে আলী বাড়িটাতে প্রবেশ করলেন। কিছু সময় পর আবু জারও ভেতরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকেই একজন মানুষের অপরূপ ছবি আবু জারের চোখে ধরা পড়ল। এর আগে কখনোই এরকম সুশ্রী কোনো মুখ তিনি দেখেননি। সেই মুখে অন্তরের আলো এবং জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছিল তীব্রভাবে। তাঁর মুখ দেখলেই মনে হতো মানুষটির মন যেন দয়া, মায়া, মমতা আর দৃঢ়তায় ভরে আছে। মানুষটির চোখ দুটো দিয়ে যেন আলো বেরিয়ে আসছিল। আবু জার এর আগে কখনোই কোনো মানুষের সংস্পর্শে এসে এরকম উষ্ণতা অনুভব করেননি।

আবু জার কয়েক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করলেন। কিভাবে তিনি নবিকে (সা) সম্ভাষণ করবেন, কিভাবেই বা কথাবার্তা শুরু করবেন। কয়েক মিনিট চলে গেল । আবু জার সামনে গিয়ে নবিজিকে (সা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আসসালামু আলাইকুম। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

রাসূল (সা) উত্তরে বললেন, "আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন।"

তারপর নবিজি (সা) আবু জারকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন,

"এটা সত্য যে, আমি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যে বার্তা নিয়ে এসেছি তাহলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, মাবুদ নেই। তিনিই আপনার, আমার ও আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা। আমাদের তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া মানুষ আর যাদের উপাসনা করে সেগুলো মানুষের কোনো উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। সেগুলো মানুষকে সঠিকভাবে জীবন যাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও দিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে এধরনের সব অকার্যকর দেবতার প্রভাব ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" এই পর্যন্ত বলেই নবিজি (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া বেশ কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন।

সত্যি কথা বলতে, ঘরে প্রবেশ করার সময় যখন আবু জারের চোখ প্রথমবারের মতো নবিজির (সা) চোখে পড়েছিল তখনই তিনি তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। পরবর্তীতে নবিজির সাথে কথা বলে তিনি ভালোভাবেই অনুধাবন করলেন যে, মক্কায় মাটি ও পাথরের তৈরি যেসব মূর্তিকে পূজা করা হয়, সেগুলোর আসলে কোনো ক্ষমতা নেই। মানুষই তাদেরকে সম্পদ দিয়ে সাজিয়ে রাখে। মানুষকে কিছু দেয়ার কিংবা মানুষের কাছ থেকে কোনো কিছুকে কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। আবু জার তার নিজের কাজের জন্যও অনুতপ্ত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি ও তার দল যেভাবে মানুষকে জিম্মি করে ধন সম্পদ বা অর্থ কেড়ে নেন, তাও বড় আকারের অন্যায়। এই অনুভূতির কারণেই আবু জার তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। সেই থেকে আবু জার (রা) রাসূলের (সা) বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠতম সাহাবিতে পরিণত হলেন।

এরপর আরো যে কয়দিন আবু জার (রা) মক্কায় ছিলেন, তিনি প্রতিদিনই রাসূলের (সা) কাছে আসতেন। রাসূলের (সা) কাছ থেকে সরাসরি অযু করার ও নামাজ আদায় করার নিয়ম শিখলেন। ইসলামের মৌলিক দাবি সম্বন্ধে অবগত হলেন। যেমন, সবসময় সত্য কথা বলা, লেনদেনে সৎ থাকা, ওয়াদা পালন করা, জুলুম ও অন্যায়ের

প্রতিবাদ করা, দরিদ্র, এতিম ও বিধবাদের সাহায্য করা, আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করা এবং সকলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা।

আরো বেশ কয়েকদিন পর আবু জার (রা) তার নিজের এলাকা ওয়াদ্দান উপত্যকায় ফিরে গেলেন। তার রাত হয়ে গেল পৌঁছতে। সেই রাতেই তিনি প্রথমে গেলেন তার ভাইয়ের বাসায় এবং তাকে এ পর্যন্ত হওয়া ঘটনাবলির প্রথম থেকে শেষ অবধি বর্ণনা করলেন। গোটা রাত জুড়েই তিনি কিভাবে আলীর (রা) সাথে দেখা হলো এবং কিভাবে তার মাধ্যমে নবিজির (সা) সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ হলো- সেই আলোচনা করে গেলেন। আনিসেরও বিষয়গুলো জানার বিশেষ করে রাসূলের (সা) মুখ নিঃসৃত বাণীগুলো শোনার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। সবশেষে আবু জার (রা) তার ভাই আনিসকে নিজের ইসলাম গ্রহণের খবরটিও জানালেন।

আবু জার (রা) বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর দয়ালু নবি (সা) আমাকে বলেছেন, "তুমি যে মুসলমান হয়েছ, নিরাপত্তার খাতিরে এটা এখনই কাউকে না জানানোই ভালো। মক্কার মানুষেরা এখন নও মুসলিমদের উপর ভীষণ খেপে আছে। আমার আশঙ্কা, তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানলে তারা তোমার তোমার ক্ষতি করতে পারে, এমনকি তোমাকে হত্যাও করতে পারে।"

আমি রাসূলের (সা) সেই পরামর্শকে সম্মানের সাথে বিবেচনা করেছি। তবে আমার মধ্যে তখন প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, আমি চিৎকার করে গোটা পৃথিবীকে জানিয়ে দেই যে, আমি সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি এবং নিজেকে সেই রাস্তায় শামিল করেছি।

আমি রাসূলকে (সা) তাই বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনিই জীবন দেয়া ও নেয়ার মালিক। আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা সবাইকে জানাতে চাই। মক্কায় থাকা অবস্থাতেই আমি কুরাইশ ও স্থানীয় সবাইকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাতে চাই। রাসূল (সা) আমার আবেগ অনুধাবন করে মৃদু হাসলেন। তিনি চুপ থাকলেন। হ্যাঁ বা না কিছুই পরিষ্কারভাবে বললেন না। আমি বুক

ভরা সাহস নিয়ে হারামে ছুটে গেলাম। কুরাইশের নীতি নির্ধারকরা তখন তাদের নির্ধারিত স্থানেই বসেছিল। তারা তখন বোধ হয় কোনো বৈঠকে ব্যস্ত ছিল। আমি যখন সেই স্থানে উপস্থিত হলাম, তারা প্রথমে আমাকে খেয়াল করেনি। আমি যখন চিৎকার করে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দিলাম, তখনি তারা আমার দিকে তাকালো এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল। আমি বললাম, "শোন হে কুরাইশ বংশের লোকেরা, আমি কিছু কথা বলছি। তোমাদের মধ্যে যারা ন্যূনতম জ্ঞান রাখ, তারা দয়া করে আমার কথাগুলো শোন। যদি তোমরা জাহান্নামের আগুনকে একটু হলেও ভয় পাও, তাহলে আমার পথ অনুসরণ কর। আমি আজ ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি পূর্ণ ঈমান এনেছি। শুধুমাত্র আল্লাহই সব জানেন। তিনিই একমাত্র কার্যকর সৃষ্টিকর্তা। তোমরা যাদের উপাসনা করে যাচ্ছ, তারা সব মিথ্যা ও ক্ষমতাহীন। এগুলো তোমাদের নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবে। তোমরা মুহাম্মাদের (সা) দেখানো পথে চলে এসো, এখনো সময় আছে।"

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই কুরাইশ লোকজন এসে আমাকে জাপটে ধরে ফেলে। একজন আমার হাত দুটোকে পেছন থেকে বেঁধে ফেলে আর অন্য কেউ একজন এসে আমার মুখে ঘুষি মারে। তারা আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল।

একজন বলল, "তোমার এতো সাহস! তুমি আমাদের মাঝে এসে এসব কথা বলে যাও।" অপর একজন এসে আমাকে যাচ্ছেতাই আঘাত করতে লাগল। আমাকে তারা এতো জোরে মারছিল যে, আমার মনে হলো আমার শরীরে বোধহয় একটি হাড়ও আর আস্ত নেই। আরও মনে হলো, আমি বোধ হয় ওখান থেকে আর বেঁচে ফিরতে পারব না।

ঠিক সেই সময় সেখানে আব্বাস এসে উপস্থিত হলেন। আব্বাস হলো রাসূলের (সা) চাচা। তাকে আমি নবি মুহাম্মাদের (সা) সেই বাসায় দেখেছিলাম। পরে আমি জানতে পারি যে, তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি তবে তার ভাতিজা মুহাম্মাদ (সা) ও তার

অনুসারীদের প্রতি তিনি খুবই সহানুভূতিশীল। আমি দেখতে পেলাম যে, ভীড়ের মধ্যে ঢুকেই আব্বাস আমাকে ধরে ফেললেন এবং ওদের আঘাত থেকে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন।

কুরাইশদেরকে থামাতে আব্বাসের বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। একটা পর্যায়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "তোমরা যাকে মারছো, জানো সে কে? তোমরা কি জানো, ওকে মারলে তোমাদের কি পরিণতি ভোগ করতে হবে?" আব্বাসের চিৎকার শুনে তারা মারা বন্ধ করল ঠিকই, তবে দুজন কুরাইশ সদস্য তখনও আমাকে জাপটে ধরে রাখলো।

আব্বাস বললেন, "এই মানুষটি গিফার গোত্রের লোক। আমাদের বণিক দলগুলো যে পথ দিয়ে যায়, সেই ওয়াদ্দান উপত্যকাতেই এদের বসবাস। যদি তোমরা এখন নিজেদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পার আর একে মেরে ফেল, তাহলে ওর গোত্রও বসে থাকবে না। তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে একইভাবে প্রতিশোধ নেবে। তারা ওয়াদ্দান দিয়ে মক্কার কোনো ব্যক্তিকেই আর যাতায়াত করতে দেবে না। বরং মক্কার কাউকে পেলেই তারা মেরে হাড়গোড় সব ভেঙ্গে দেবে।"

আব্বাসের কথা শুনে কুরাইশরা একটু সংযত হলো। যে দুজন আমাকে ধরে রেখেছিল তারা আমাকে দরজার কাছে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। আমি আব্বাসের দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় ধন্যবাদ জানালাম। আব্বাসও সেই ভাষা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে তার উত্তর দিলেন।

"সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমি আবার নবিজির (সা) বাসার দিকে গেলাম। তখন আমি আমার বৃথা সাহসের অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অনুতপ্ত ছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে এমনটা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যাহোক, আমি যখন নবিজির কাছে গেলাম, সব খুলে বললাম এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখালাম। তখন তিনি বললেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, এখনই ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার দরকার নেই?"

আমি নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পারলাম এবং সম্মতি সূচক মাথা

নাড়ালাম। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি মনে করেছিলাম, তারা আমার কথাকে গুরুত্বের সাথে নিবে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল।"

নবিজি (সা) বললেন, "শোন আবু জার, অহেতুক মার খাওয়ার চেয়ে এখন তোমার হাতে আরো অনেক জরুরি কাজ রয়েছে। তুমি তোমার এলাকায় ফিরে যাও আর গত কয়েকদিন যা শিখলে তা তোমার এলাকার বাসিন্দাদের জানাও। তাদেরকে এক আল্লাহর পথে আসার আহ্বান কর। যদি আল্লাহ সাহায্য করেন, নিশ্চয়ই তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে, আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। আর তুমিও তোমার চেষ্টার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ, এমন সময় আসবে, যখন আর কাউকে অত্যাচারের ভয়ে গোপনে গোপনে কাজ করার প্রয়োজন পড়বে না। তখন আল্লাহ তায়ালাই আমাদের প্রকাশ্যে কাজ করার নির্দেশ দিবেন। যদি কখনো খবর পাও যে, সেই সময় এসে গেছে, তাহলে তুমি তখন আমার কাছে এসো। আমরা তখন একসাথে সবাই মিলে প্রকাশ্যে দীনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

আবু জার (রা) তার ভাইকে লম্বা সময় নিয়ে এই কথাগুলো বললেন। আর জানালেন, "রাসূলের (সা) সাথে ওটাই ছিল তার সর্বশেষ কথোপকথন। রাসূলের (সা) নির্দেশনা পাওয়ার পর আমি তার দোয়া নিয়ে বেরিয়ে আসি আর আলী (রা) আমাকে মক্কার শেষ সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়।"

আনিস এতোক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে তার ভাইয়ের কথাগুলো শুনছিল। তন্ময় হয়েই তার আরো কিছু মুহূর্ত কেটে গেল। একটা সময় পর আনিস বলল, "ভাই, আমি জানি তুমি সঠিক পথেরই সন্ধান পেয়েছ। আমিও তোমার মতো সঠিক পথেই চলতে চাই। চল, সবার আগে আমরা আমাদের মায়ের কাছে গিয়ে তাকে খবরটা দিই। তারপর আমাদের গিফার গোত্রের সবার কাছে দুই ভাই মিলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেই। যদি আল্লাহ সাহায্য করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের মন আমাদের ডাকে সাড়া দেবে এবং তারা সত্য ও সুন্দরের পথে শামিল হবে।"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আনিসের কথা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। আনিস ও আবু জার (রা) দুই ভাই মিলে প্রথমে মাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। মা জননীও সাথে সাথে ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন। তারপর মা তার দুই সন্তানকে নিয়ে গিফার গোত্রের প্রতিটি তাবুতে, প্রতিটি বাড়িতে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দিতে শুরু করেন। তারা বিভিন্ন বাজার এবং জনসমাগম হয় এমন স্থানে ইসলামের পক্ষে কথা বলেন। পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দিয়েও মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করেন। ধীরে ধীরে কিছু মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দেয়। ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং একটা সময়ে আবু জারের (রা) সত্যসন্ধানী প্রচেষ্টার বদৌলতে গোটা গিফার গোত্রই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে সমবেত হয়। আজও অবধি, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান রাসূলের (সা) এই সাহাবিকে স্মরণ করে- যিনি একেবারেই নিজ উদ্যোগে সত্যের সন্ধান করতে করতে রাসূলের (সা) সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইসলামকে চিনতে এবং ইসলাম কবুল করতে সাহস দেখিয়েছিলেন। ইতিহাসে রাসূলের (সা) ঘনিষ্ঠতম এই সাহাবি হযরত আবু জার গিফারি (রা) নামেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলামের ছায়াতলে উমর (রা)

সেই রাতে উমরের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অনেকটা সময় ছটফট করে অবশেষে তিনি উঠে গেলেন। দরজা খুলে বাসার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ, রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। একজন মানুষও নেই। সেই গভীর রাতেও উমর লক্ষ্য করলেন, শূন্য রাস্তায় একজন মানুষ কাবা ঘরের দিকে হেটে যাচ্ছে। খুব সাবধানে এবং মার্জিতভাবে লোকটি হাঁটছিলেন। কোনো তাড়াহুড়া নেই। মানুষটি খুব একটা লম্বা নয়, আবার বেটেও নয়। তারপরও মনে হচ্ছিল যে, লোকটা তার আশপাশের সব কিছুর তুলনায় যেন অনেক বেশি উঁচু। সবাইকে তিনি যেন উচ্চতায় ছাড়িয়ে গেছেন।

উমর একটু ভালোভাবে তাকিয়ে লোকটাকে চিনে ফেললেন। এ তো মুহাম্মাদ (সা), আব্দুল্লাহর ছেলে। এই মুহাম্মাদকেই (সা) এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন উমর। এই মুহাম্মাদ (সা) মক্কায়

নতুন করে ঝামেলা সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে নতুন ধর্মের দিকে ডাকছেন। মক্কার এতো বছরের সম্মান, ব্যবসা বাণিজ্য সবই হুমকির মুখে পড়েছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন তারা যেসব দেব-দেবী ও মূর্তির পূজা করে আসছেন, মুহাম্মাদ (সা) সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। এসব দেব-দেবী নাকি আসল প্রভু নয়। এসব অক্ষম ও অকার্যকর দেব-দেবীকে ছেড়ে মুহাম্মাদ (সা) মক্কাবাসীকে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন। উমরের মনে তাই মুহাম্মাদের (সা) প্রতি অনেক রাগ ও ঘৃণা জমা হয়ে আছে। কেননা এই মুহাম্মাদের (সা) কারণেই কুরাইশদের মাঝে আজ ফাটল ধরেছে। বাবা-ছেলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, আবার ছেলে হয়ে গেছে বাবার শত্রু। ভাই-ভাইয়ের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে। স্ত্রীও স্বামীর বিরুদ্ধে চলে গেছে। সব মিলিয়ে গোটা সমাজে একটা অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে আর তেমন হয়েছে শুধুমাত্র এই এক মুহাম্মাদের (সা) জন্যই।

মুহাম্মাদকে (সা) দেখা মাত্রই উমরের আবার দুঃসহ রাতের কথা মনে পড়ে গেল । মনে পড়ল তার চাচাতো বোন উম্মে আব্দুল্লাহর কথা। এই বোন গত রাতে তাকে কিছু কথা বলেছেন। এই কথাগুলো উমরের মনে এতোটাই রেখাপাত করেছে যে, তারপর থেকে তিনি আর স্বাভাবিক হতে পারেননি। ঘুমাতেও পারেননি। ছটফট করেছেন। আর এখন মধ্যরাতে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ বাড়ির অন্য সবাই কি শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।

উম্মে আব্দুল্লাহর (রা) মায়াবী মুখটা বার বার উমরের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। উম্মে আব্দুল্লাহ (রা) বলছিলেন, "শোন উমর, তোমার মতো কিছু মানুষের জন্যই আমাদের সবার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে।"

উম্মে আব্দুল্লাহ (রা) আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই সৌভাগ্যবতী নারীদের মধ্যে একজন যারা রাসূলের (সা) আদেশে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। উমরের বোন হওয়া স্বত্ত্বেও মক্কায় থাকাকালীন সময়ে ইসলাম অনুসরণ করার জন্য উম্মে আব্দুল্লাহকে (রা) অনেক বেশি নির্যাতন সইতে হয়েছে। উমর নতুন

ধর্ম তথা ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর অনেক বেশি ক্ষিপ্ত থাকায় তাদের উপর অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাতেন। তাই বলে তিনি কখনো ভাবেননি যে, তার কারণে তারই চাচাতো বোনকে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এভাবে মক্কা ছেড়ে অনেকগুলো মানুষ আবিসিনিয়ায় চলে যাওয়ায় উক্ত পরিবারগুলোতে বড় আকারের ফাটল দেখা দিল। এই ভাঙ্গা পরিবারগুলোর চিত্র উমরকে তো শান্ত করলই না, বরং তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরো বেশি করে উঠেপড়ে লাগলেন। উমর শুধু ভাবতেন, "কি আছে ঐ মুহাম্মাদের মধ্যে, তার নতুন ধর্মের আহ্বানের মধ্যে, যাকে ভালোবেসে মানুষ জন্মভূমিকে ছেড়ে যেতেও পরোয়া করছে না?"

এই ঘটনার কয়েকদিন আগের কথা। উমর সেদিন উম্মে আব্দুল্লাহর (রা) বাসায় গিয়েছিলেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য। ভাইবোনের মধ্যে ওটাই ছিল সর্বশেষ সাক্ষাৎ। বোন উম্মে আব্দুল্লাহ (রা) তখন হিজরতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। উমর সেই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে যান। বোনকে তিনি প্রশ্ন করেন, "শেষ পর্যন্ত তুমিও মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছো?"

আর তখনই উম্মে আব্দুল্লাহ বলেছিলেন, "হ্যাঁ, কারণ তুমি আর তোমার মতো আরো কয়েকজন মানুষ মিলে আমাদের জীবনকে রীতিমতো দুঃসহ করে তুলেছ। অথচ আমরা অন্যায় কিছু করিনি। আমাদের একমাত্র অপরাধ, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি, আল্লাহই আমাদের হেফাজত করবেন এবং সঠিক পথের নির্দেশনা দেবেন যাতে করে আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাঁর ইবাদত করে যেতে পারি।"

অন্য কোনো সময় হলে, উমর হয়তো রেগে বোনকে আঘাত করতেন। এই বিষয়টা তিনি মানতেই পারছিলেন না যে, তার নিজের শহর, নিজের গোত্রের লোকজন মুহাম্মাদের (সা) কথা শুনে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে নতুন একটি ধর্মকে গ্রহণ করছে। কিন্তু তারপরও তিনি বোনকে কিছুই বলেননি। কেননা যারা মক্কা ছেড়ে

যাচ্ছে তারা সবাই আচার আচরণে অন্য সবার তুলনায় ভালো। তাছাড়া নতুন ধর্মকে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো অপরাধও তারা করেনি।

উমর তাই বোনকে কিছু বলতে গিয়েও আর বলতে পারলেন না। তার অন্তরটা কেমন যেন করে উঠল। এমনকি উমরের চোখেও পানি চলে আসলো। তারপরও তিনি রেগে গিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি তা বলতে পারলেন না। বরং অজান্তেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "আচ্ছা যাও তাহলে, তোমার আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন।"

উম্মে আব্দুল্লাহ (রা) উমরের এই আচরণে বেশ অবাক হয়েছিলেন। কেননা উমরকে এর আগে তিনি কখনোই এতোটা নমনীয় স্বরে কথা বলতে দেখেননি। উমর মক্কার সবচেয়ে রুক্ষ ও উগ্র মেজাজের লোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাই হঠাৎ তার নমনীয়তা হযরত উম্মে আব্দুল্লাহকে (রা) যেন খানিকটা হলেও আশাবাদি করল। তিনি ভাবলেন, আল্লাহ কি উমরের উপর রহম করছেন? উমর কি হেদায়েতের দিশা পেতে যাচ্ছেন?

সেদিন সন্ধ্যায় স্বামী বাসায় আসার পর উম্মে আব্দুল্লাহ (রা) তাকে সব অবহিত করেন। তাকে জানান যে, সকালে উমর এসেছিল। উম্মে আব্দুল্লাহ (রা) স্বামীর কাছেও আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, "কোনো একদিন আসবে যেদিন উমর ইসলাম গ্রহণ না করলেও ইসলামের প্রতি নমনীয় হবে। অন্তত আজকের কথোপকথনের পর আমার তাই মনে হচ্ছে।"

উম্মে আব্দুল্লাহর (রা) স্বামীর নাম আমির (রা)। তিনিও অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্ত্রীর কথায় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তোমাকে আজ বকাবকি করেনি, গালি দেয়নি, শুধু সেই জন্যই তুমি ভেবে নিচ্ছো যে উমর ইসলামের ছায়াতলে আসবে?"

উম্মে আব্দুল্লাহ (রা) উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি যথেষ্ট আশাবাদী।"

কিন্তু আমির (রা) তার সাথে একমতো হলেন না। তিনি বললেন, "উমরের বৃদ্ধ পিতা খাত্তাব কখনো ইসলাম গ্রহণ করলেও করতে পারে

কিন্তু উমর কখনোই এই পথে হাঁটবে না।"

তবে সত্যি কথা হলো, বোন উম্মে আব্দুল্লাহর (রা) সেই কথাবার্তা উমরের মনে ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার বুদ্ধিবিবেক সবই প্রচণ্ড পরিমাণে আবিষ্ট হয়েছিল। তিনি বার বার ভাবছিলেন যে, নতুন ধর্মে এমন কি আছে যে তাকে বিশ্বাস করার জন্য মানুষ এতোটা অত্যাচার সহ্য করতে পারে? কিংবা শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ করার জন্য মানুষ নিজ দেশ ছেড়েও চলে যেতে পারে? নতুন ধর্মকে বরণ করে নেয়া এই মানুষগুলোর উপর যে কয়েকজন মানুষ অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল, উমর ছিলেন তার মধ্যে একজন। তাই তার মধ্যে অপরাধবোধও কাজ করছিল। কিন্তু তার আত্মঅহংকার এতোই বেশি ছিল, তিনি প্রকাশ্যে তা স্বীকারও করতে পারছিলেন না। মূলত এ মানসিক দ্বন্দ্বের কারণেই রাতের পর রাত তার ঘুম হচ্ছিল না।

এরকমই এক নির্ঘুম রাত পার করতে করতেই সেই রাতটি এলো যার কথা এই গল্পের শুরুতে বলেছিলাম। অর্থাৎ যে রাতে মুহাম্মাদ (সা) কাবার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মানসিক এই জটিল অবস্থার মধ্যে মুহাম্মাদকে (সা) দেখে উমর যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কেননা তার মনে হলো এই লোকটাই হলো সব সমস্যার মূল। তার কারণেই অসংখ্য পরিবারে ফাটল ধরেছে, কিশোর আর যুবক-যুবতীরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। আর সবাইকে ভুল পথে নিয়ে উনি এখন দিব্যি কাবায় ইবাদত করতে যাচ্ছেন।

উমর মনে মনে আরো ভাবলেন, "আমি হলাম মক্কার সবচেয়ে উগ্র মেজাজী লোক। আমাকে সবাই ভয় পায়। আমি ইসলামকে অন্য যে কোনো কিছুর তুলনায় বেশি ঘৃণা করি। তাই মুহাম্মাদকে (সা) যখন আজ এভাবে একা পেয়েছি, ওকে আমি ছাড়ব না। বরং ও কি করে, কোথায় যায় আজ সবকিছুই আমি দেখব।"

উমর সেই গভীর রাতে নবি মুহাম্মাদের (সা) পিছু পিছু কাবার দিকে হাঁটতে লাগলেন। কাবার চত্বরে ঢুকে উমর দেখলেন নবিজি (সা) উত্তরের দিকে অর্থাৎ জেরুজালেম শহরের দিকে মুখ করে ইবাদত করছেন, আল্লাহর নাম জিকির করছেন। মুহাম্মাদ (সা)

সেখানে তেলাওয়াতও করছিলেন। মুহাম্মাদ (সা) দাবি করেন যে, এই আয়াতগুলো সবই কুরআনের এবং এই আয়াতগুলোর সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতার মাধ্যমে নাজিল হয়। কিন্তু এর আগে কখনোই উমর কুরআনের কোনো আয়াত সরাসরি শোনার সুযোগ পাননি। ইসলামকে তিনি এতোটাই ঘৃণা করতেন যে তার ভেতরে কুরআনের বাণী শোনার মতো আগ্রহই কখনো তৈরি হয়নি।

উমর ইতস্তত করছিলেন, তেলাওয়াত শুনবেন নাকি বাসায় ফিরে যাবেন। ঠিক তখনই বোন উম্মে আব্দুল্লাহর (রা) চেহারা উমরের চোখে আবারও ভেসে উঠল। ফলে তার মনে কুরআনের তেলাওয়াত শোনার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। উমর ভাবলেন, "একটু শুনে দেখি। কি এমন আছে কুরআনের আয়াতগুলোতে যা কি না মানুষকে জাদুচ্ছন্ন করে ফেলে। মানুষ কেন কুরআনের মায়ায় নিজের আয় রোজগার, জীবিকা এমনকি বাপ-দাদার পুরনো প্রথাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে? তাছাড়া আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি মক্কার সবচেয়ে কঠিন হৃদয়ের মানুষ। তাই কোনো জাদু বা মন্ত্র আমাকে কাবু করতে পারবে না।"

তিনি কাবার লম্বা গিলাফের আড়ালে লুকিয়ে আস্তে আস্তে মুহাম্মাদের (সা) কাছাকাছি চলে গেলেন যাতে তিনি স্পষ্ট কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে পান। এবার তিনি পরিষ্কারভাবে তেলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিলেন।

"সুনিশ্চিত বিষয়।

সুনিশ্চিত বিষয় কি?

আপনি কি জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি?

আদ ও সামুদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল। তারপর প্রলয়ঙ্কারী এক বিপর্যয়ের মাধ্যমে সামুদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল। আর আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসের মাধ্যমে, যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরামভাবে। তারা এখন অসার খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। আপনি তাদের আর কোনো অস্তিত্ব

দেখতে পান কি?

ফেরাউন, তাঁর পূর্ববর্তীরা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরগুলোর নাগরিকরা গুরুতর পাপ করেছিল। তারা তাদের পালনকর্তার পাঠানো রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদের চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। যাতে এ ঘটনাকে তোমরা স্মরণে রাখ এবং তোমাদের কানগুলো এই স্মৃতিময় ঘটনা থেকে নিয়মিত শিক্ষা নেয়।

যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে-একটি মাত্র ফুৎকারে সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। ..... সেদিন তোমাদের উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কিছু গোপন থাকবে না। অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তাকে বলা হবে, 'নাও, তোমার আমলনামা পড়ে দেখ। সে বলবে, 'আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' অতঃপর সে সুখী জীবনযাপন করবে।.....

যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : হায় যদি আমার আমলনামা আমায় না দেয়া হতো। আমি যদি আমার পাপ-পূণ্যের হিসেব না জানতাম! হায়, আমার মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যেতো। আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেল।.....

নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না। এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করত না। অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোনো শুভাকাঙ্খি নেই এবং ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত কোনো খাদ্য নেই। আর গোনাহগার বান্দা ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।" (সূরা আল হাক্কাহ : আয়াত ১-৩৭)

আল কুরআনের এই সতর্কতামূলক বাণীগুলো সরাসরি হযরত উমরের (রা) অন্তরে গিয়ে আঘাত করল। তিনি নিজের উপর যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিলেন। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বেশ উঠানামা করছিল। তিনি অনুভব করছিলেন, প্রকৃতপক্ষেই এই কুরআন এবং কুরআনের আয়াতগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী।

এর কিছু সময় পর আবার তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। তার মনে হলো, তিনি তো কুরআনের মোহে পড়ে যাচ্ছেন। সাথে সাথেই তিনি নিজেকে বোঝালেন, "এটা কবিতা। নিতান্তই সুন্দর কিছু কবিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই কবিতা শুনেই কুরাইশ গোত্রের অনেকেই ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারছে না।"

হযরত উমরের (রা) মধ্যে যখন দুই ধরনের চিন্তা ভাবনার মধ্যকার সংঘাত ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই তার কানে আবারও রাসূলের (সা) কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ প্রবেশ করল। আবারও তিনি কুরআনের মোহে আর ভালোবাসায় আবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

রাসূল (সা) তেলাওয়াত করছিলেন, "এটা কোনো কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর।" (সূরা হাক্কাহ : আয়াত ৪১)

এই আয়াতগুলো শুনে হযরত উমর (রা) আবার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি চিন্তা করলেন, "আমি যা ভাবছিলাম তার উত্তর এই ব্যক্তি (হযরত মুহাম্মাদ সা) কিভাবে দিলেন। তিনি যদি এভাবেই মনের কথা বুঝতে পারেন তাহলে তো তিনি একজন জ্যোতিষী, একজন জাদুকর।" হযরত উমর (রা) যখন এই সব ভাবছিলেন তখনই রাসূল (সা) আবার তেলাওয়াত করলেন,

"এটা কোনো ভবিষ্যতবক্তা বা জ্যোতিষীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটা বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। সে (নবি) যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা।" (সূরা আল হাক্কাহ : আয়াত ৪২-৪৬)

হযরত উমরের (রা) মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতির সৃষ্টি হলো। এর আগে কখনো তিনি এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি। তার মনে যত ধরনের প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, তার সবগুলোর উত্তরই যেন এই আয়াতগুলোর মাঝে তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। এই আয়াতে নিশ্চিত করেই বলা হচ্ছে যে, যদি মুহাম্মাদ মিথ্যা বলে, যদি আসলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর অহি নাজিল না হয় এবং সে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলে, তাহলে আল্লাহই তাকে ধ্বংস করে দেবেন।

হযরত উমর (রা) এই মানসিক চাপ আর নিতে পারছিলেন না। সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়ে তিনি গিলাফের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং চুপচাপ আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। একটু পর ভোর হয়ে এলো। সুবহে সাদিকের ক্ষীণ গোলাপি আভায় মক্কা শহর আবার আলোকিত হতে শুরু করল। অন্ধকার থেকে যেমন গোটা শহর ক্রমশ আলোয় ভরে উঠছিল, ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে হযরত উমরের (রা) মনের কালিমা আর অন্ধকারও ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। তার হৃদয়ের গভীরে ঈমানের চেতনা আস্তে ধীরে প্রবেশ করছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মানসিক দ্বন্দ্বটাও তখন আরো প্রকট হয়ে উঠছিল। একদিকে তিনি যেমন সত্যের কিছু নিশানা অনুধাবন করছিলেন, আবার অন্যদিকে নতুন ধর্মের প্রতি এই দুর্বলতা তার ভেতরকার রাগ ও জিদকেও ক্রমশ বৃদ্ধি করছিল।

তার মনের একটি অংশ চাইছিল, গতরাতে যেই তেলাওয়াত শুনেছে বা তার প্রিয়তম বোন উম্মে আব্দুল্লাহর (রা) চেহারা, সবকিছুকেই ভুলিয়ে দিতে। যাতে উমর (রা) আগের মতোই থাকতে পারেন। কিন্তু এটা খুব সহজ ছিল না। মনের গহীনের অপর অংশটি যেন সত্য পথের নবি মুহাম্মাদকে (সা) চিনে ফেলেছিল। বিবেকের সেই চেতনা উমরকে (রা) বলছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) যা বলছেন তা নতুন কিছু নয়, বরং পূর্বসূরীরাও একই ধরনের কথা বলে গিয়েছিলেন। সত্যের কাছাকাছি থাকার পরও মনের ভেতর থাকা আত্মঅহংকার উমরকে (রা) দমিয়ে রাখছিল। আত্মঅহংকারের ফাঁদে পড়ে তিনি ভাবছিলেন, "এতো বছর আমরা যে ধর্মীয় আচারাদি পালন করে আসছি, সেদিনের এক যুবকের কথায় তা আমরা ছেড়ে দিব? উম্মে আব্দুল্লাহর (রা) মতো সামান্য একটি মেয়ের কথায় আমি আমার নিজ ধর্ম ত্যাগ করব?"

এদিকে, ভিন্ন এক পরিস্থিতি তখন বিরাজ করছিল নও মুসলিমদের মাঝে। তারা সে সময় মক্কায় প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছিলেন। তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারও করতে পারছিলেন না। আবার হারামে গিয়ে প্রকাশ্যে ইবাদতও করতে পারছিলেন না। আর এই

কঠিন ও দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে উমরের (রা) অবদানই সবচেয়ে বেশি। নও মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম আর নির্যাতনকারীর সংখ্যা ছিল বেশি। যারা নির্যাতন করত তাদের মধ্যে আবার উমরের (রা) মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ ও রাগী আর কেউ ছিল না।

সেই সময় মুসলমানদের মূল ঘাঁটি ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। আরকাম (রা) নামক এক সাহাবির বাসায়। মুসলমানরা তখন প্রায়শই এসে আরকামের বাসায় থাকতেন। সেখানে কয়েকদিন থেকে তারা নিয়মিত চর্চা করে নাজিল হওয়া কুরআনের আয়াতগুলো মুখস্থ করে নিতেন। সেই সাথে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলিও অনুশীলন করতেন। পাশাপাশি কিভাবে মক্কাবাসীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেবেন, কিংবা সামনে পরিস্থিতি আরো প্রতিকুল হয়ে উঠলে কিভাবে তার মোকাবেলা করা যাবে- এগুলো নিয়েও তারা নিয়মিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করতেন।

নবিজি (সা) মুসলমানদেরকে একাধিক গ্রুপে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সিনিয়র সাহাবি। হযরত আরকামের (রা) বাড়ির পাশাপাশি আরো বিভিন্ন স্থানে তারা বিক্ষিপ্তভাবে বসতেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন, মুখস্থ করতেন এবং সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াতগুলো বিভিন্ন গাছের পাতা এবং পাথরের উপর লিখে রাখার কাজগুলো করতেন। অনেক পরে গিয়ে এসব টুকরো টুকরো লেখাগুলোকে সন্নিবেসিত করেই সমগ্র কুরআন শরিফের কাঠামো প্রস্তুত করা হয়।

হযরত উমর (রা) তখনও অবধি মুসলমানদের এতো সব কর্মকান্ডের কথা জানতেন না। এমনকি তিনি এও জানতেন না যে, শুধু তার চাচাতো বোন উম্মে আব্দুল্লাহই (রা) নয়, বরং তার আপন বোন ফাতিমা (রা), তার বোন জামাই সাইদও (রা) এরই মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের বাসাকেও মুসলমানরা উপরোক্ত কাজগুলো করার জন্য নিয়মিতভাবে ব্যবহার করতেন।

এরকম পরিস্থিতিতে একদিন রাসূল (সা) তাঁর বাসায় আগত বেশ কিছু মুসলমানদের সাথে কিছু বিষয়ে শলা-পরামর্শ করছিলেন। তাদের

কাছে খবর এসেছিল যে, প্রভাবশালী কুরাইশ নেতা আবু জেহেল, উমর বিন খাত্তাব ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানোর পরিকল্পনা করছে। নও মুসলিম সাহাবিদের বেশিরভাগই পালিয়ে যেতে বা লুকোতে চাইছিলেন। কারণ মুসলমানরা তখনও সংখ্যায় তত বেশি হয়নি যে তারা কুরাইশদের মোকাবেলা করতে পারবে।

একজন সাহাবি বললেন,"আমরা যারা মুসলমান হয়েছি, তাদের অধিকাংশই আগে ক্রীতদাস ছিলাম, আমাদের বয়সও কম। আমরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে কী-ই বা করতে পারব? আমাদের এখন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিরও প্রয়োজন।"

সাহাবির কথাতে অন্য সবাই একমত হলেও তারা বিষন্ন চেহারাতেই রইলেন। কারণ মক্কার তৎকালীন বাস্তবতায় প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ তখনও রীতিমতো অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত ছিল।

রাসূল (সা) তখনো পর্যন্ত চুপ ছিলেন। তিনি নীরবে সাহাবিদের আলোচনা শুনছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে মুনাজাত শুরু করলেন। তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আপনি ইসলামের পক্ষের শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করে দিন। আপনি হিশামের ছেলে আবু জেহেল কিংবা খাত্তাবের ছেলে উমরকে ইসলামের জন্য কবুল করুন। হে আল্লাহ, এই দুজন ব্যক্তির মধ্যে যাকে আপনি বেশি ভালোবাসেন তাকে হেদায়েত করুন।"

সেই ঘরে উপস্থিত যে সাহাবিরা রাসূলের (সা) এই মুনাজাত শুনলেন, তারাও মনে মনে আরো কয়েকবার একই দোয়া করলেন। তারা সকলেই আমিন আমিন বলে দোয়াতে শরিক হলেন।

এদিকে উমরের (রা) মনের গহীনে তখনো ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সেই রাতে কাবার গিলাফের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি কুরআনের যে আয়াতগুলো শুনেছিলেন, তা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। তার জাগরণে, স্বপনে সেই আয়াতগুলো বার বার ভেসে আসছিল। এমনকি তার ভালোমতো ঘুমও হচ্ছিল না। "যখন শিংগায় ফুৎকার

দেয়া হবে-একটি মাত্র ফুৎকারে সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কিছু গোপন থাকবে না।"- কুরআনের এই অমিয় বাণীগুলো তার হৃদয় ও মনকে পরাভূত করে ফেলছিল।

কিন্তু মনের ভেতরকার এই ঝঞ্ঝামুখর পরিস্থিতি স্বত্ত্বেও রাসূলের (সা) উপর উমরের রাগ কোনোভাবেই কমছিল না। ইসলামের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান থেকে তিনি একচুল সরে আসতে পারেননি। একদিন সকালে মনের সাথে বোঝাপড়া করে তিনি তাৎক্ষণিকভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। উমর (রা) ভাবলেন, "আমার সমস্যাটা কি? শরীরের কোথাও যদি কোনো ফোড়া বা টিউমার হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে দেয়াই হলো একমাত্র সমাধান। ঠিক তেমনিভাবেই কোনো ব্যক্তি যদি আমার শান্তিপূর্ণ শহরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাহলে তাকেও কেটে হত্যা করাই হবে সঠিক সমাধান।" এই কথা ভেবেই তিনি নিজের তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

উমর (রা) বরাবরই ছিলেন কাজে বিশ্বাসী। কোনো চিন্তা একবার তার মাথায় আসলে তা বাস্তবায়ন না করে তিনি থামতেন না। তাছাড়া যখনকার কথা বলছি, তখন পর্যন্ত তিনি দৃঢ়ভাবে এও বিশ্বাস করতেন, যে কোনো চিন্তা বা আদর্শকে শক্তি প্রয়োগ করে দাবিয়ে রাখা যায়। তখনও তিনি ইসলামের মর্মবাণীর শক্তি বুঝতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন শক্তি প্রয়োগ করে বা ভয় দেখিয়েই মুসলমানদের প্রতিহত করা যাবে। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হবে।

উমর (রা) ঘর থেকে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বের হলেন। মক্কার রাস্তায় এভাবে তলোয়ার নিয়ে হাঁটার দৃশ্য কারো নজর এড়ালো না। তরবারি নাচাতে নাচাতে তিনি সবার আগে গেলেন তার চাচাতো ভাই নুয়াইমের বাসায়। নুয়াইম দরজা খুলে যখন দেখলেন যে উমর খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখনই তিনি যা বোঝার তা বুঝে ফেললেন। তবে তিনি নিজেকে শান্ত রাখলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন,"উমর, তুমি তলোয়ার নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?"

উমরের (রা) চেহারায় তখন দৃঢ়তা আর রাগের উন্মত্ত বহিঃপ্রকাশ

ঘটছিল। তিনি বললেন,"কোথায় যাচ্ছি!! ভালো প্রশ্ন করেছ। যে সমস্যা আমাদের ঘাড়ের উপর চড়ে বসেছে আমি তার সুরাহা করতে যাচ্ছি। যে ব্যক্তি আমাদের কুরাইশদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে, আমাদের বাপ দাদার ধর্মকে কলঙ্কিত করেছে, যে আমাদের দেব-দেবীকে হেয় করেছে, আমি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি। আমি তাকে হত্যা করলে তাঁর আজেবাজে কথা বলার মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।" তলোয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উমর আরো বললেন,"এই তলোয়ার দিয়েই আমি তাকে হত্যা করব।"

উমরের (রা) রুদ্রমূর্তি দেখে নুয়াইমের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। উমরকে কিভাবে ঠাণ্ডা করা যায় তা নিয়ে নুয়াইম পেরেশান ছিলেন। তখন নুয়াইমের মাথায় একটা চিন্তা আসল। তার মনে হলো, উমরকে এই কথাগুলো বললে হয়তো তাকে এই উন্মত্ত আচরণ থেকে বিরত রাখা যাবে। তিনি উমরকে বললেন,"মুহাম্মাদকে হত্যা করার বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে? তুমি কি মনে কর, তাকে হত্যা করলে তুমি বেঁচে ফিরতে পারবে? তুমি কি জানো না যে, সে কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রের লোক? তাকে হত্যা করলে বনু হাশিমের লোকেরা আমাদের বনু আদি গোত্রের লোকদেরকেও হত্যা করতে শুরু করবে।"

উমর (রা) এই প্রশ্ন শুনে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "নুয়াইম তুমিও আসলে ওর ভক্ত হয়ে গেছ। তোমার মাথায়ও পাগলামি ভর করেছে। কাছে এসো, আমি তোমাকেও সুস্থ করি।"

নুয়াইম বললেন, "তুমি আমাকে পাগল বলছ? তুমি আসলে বোকা, তুমি কিছুই জানো না। তুমি নিজেও জানো না যে, তোমার আপন বোন ফাতিমাও অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এমনকি তোমার ভগ্নিপতি সাইদও মুসলমান হয়েছে। তারা অন্তত তোমার চেয়ে জ্ঞানী। তারা সত্য পথ চেনার পরও তোমার মতো একগুয়েমি করে বাতিল চিন্তাকে ধরে রাখেনি। বরং তারা বলিষ্ঠ পায়েই সত্য পথের উপর দিয়ে হেঁটেছে।"

উমর (রা) বললেন, "নুয়াইম তুমি মিথ্যা বলছ।"

এটা তিনি বললেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো বোনের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে উমরের মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। তিনি তলোয়ার নিয়ে বের হয়ে গেলেন। তবে এবার আর নবিজির (সা) ঘরের দিকে নয় বরং তার বোন ফাতিমার বাসার পথে। নুয়াইম উমরকে (রা) ঠেকাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে উমর (রা) তার বোনের বাসার পথে অগ্রসর হলেন।

নুয়াইমের বাসা থেকে ফাতিমার (রা) বাসা ছিল বেশ দূরে। ততখানি পথ হেঁটে উমর যতক্ষণে বোনের বাসায় পৌঁছলেন, ততক্ষণে তার রাগ অনেকটাই কমে গেছে। উমর (রা) দীর্ঘ পথ হেঁটে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বোনের বাসার সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাপাচ্ছিলেন আর বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই তার কানে ঘরের ভেতর থেকে উচ্চারিত কিছু শব্দ ভেসে আসল। প্রথমদিকে উমর (রা) একটু অস্বস্তিতে থাকলেও একটু পর সিদ্ধান্ত নিয়েই ঘরের দরজায় কান পাতলেন। তিনি বুঝতে চাইছিলেন আসলে কে কথা বলছে বা কি নিয়ে কথা বলছে। তার বোন ইসলাম গ্রহণ করেছে কি না এটা তিনি তখনো বিশ্বাস করতে পারেননি। বোনের প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য গোয়েন্দাবৃত্তি করাটাই তার কাছে উত্তম মনে হলো।

ঘরে সে সময় ফাতিমা, তার স্বামী সাইদ এবং তাদের উস্তাদ খাব্বাব (রা) উপস্থিত ছিলেন। তারা সর্বশেষ নাজিল হওয়া কুরআনের আয়াতগুলো তেলাওয়াত ও মুখস্থ করছিলেন। ঠিক তখন তারাও টের পেলেন যে দরজার বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ফাতিমা প্রশ্ন করলেন, "কে ওখানে?"

উমর (রা) উত্তর দিলেন, "আমি উমর। উমর বিন খাত্তাব।"

উমরের (রা) কণ্ঠ শুনেই খাব্বাবকে (রা) তারা ভেতরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। আর যে পাতায় ও পাথরে আয়াতগুলো লেখা হয়েছিল, সেগুলোকে ফাতিমা জলদি তার জামার ভেতর লুকিয়ে ফেললেন। সাইদ (রা) দরজা খুললেন। তিনি দেখলেন উমর (রা) উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

উমর (রা) প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি পড়ছিলে? অস্বীকার কর না, আমি সব শুনতে পেয়েছি।"

ফাতিমা ও সাইদ একে অপরের দিকে তাকালেন। তারা ইশারায় বোঝালেন, এখন আর কিছু লুকোনোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।

সাইদই প্রথম মুখ খুললেন, "যা সত্য আপনি কখনোই তাকে দমন করতে পারবেন না"।

এই কথা শুনে উমর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি সামনে এগিয়ে এসে ভগ্নিপতি সাইদের জামার কলার জাপটে ধরার চেষ্টা করলেন। সাইদও ভারসাম্য রাখতে পারলেন না। একপর্যায়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। উমর এবার তার গলার উপর চড়ে বসলেন এবং তলোয়ারটি মাথার সামনে ধরলেন। ফাতিমা চিৎকার করে স্বামীর পাশে গিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। তিনি উমরকে চিৎকার দিয়ে সরে যেতে বললেন।

উমরের (রা) রাগ তখন এতো বেশি ছিল যে, তিনি ফাতিমার কথা তো শুনলেনই না, উল্টো তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। ঘরের এক কোনায় গিয়ে ধাক্কা খাওয়ায় ফাতিমার কপাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। এবার ফাতিমা সব ধরনের ভয়কে উপেক্ষা করে সাহস করে উমরের সামনে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে সত্য পথের শত্রু, আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি বলেই কি আপনি আমাদেরকে এতো ঘৃণা করেন? ঠিক আছে, তাহলে আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন। তারপরও আমরা বলতেই থাকব, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই আর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রাসূল। আপনি শত নির্যাতন করে, ঘৃণা করে আমাদের এই বিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন না। আমরা কখনোই ইসলাম ত্যাগ করব না।"

বোনের এই দ্বীপ্ত কণ্ঠ উমরকে (রা) এতোটাই অভিভূত করল যে তার রাগ সাথে সাথেই যেন ঠাণ্ডা বরফে পরিণত হলো। তার মাথাটাও ঠাণ্ডা হলো, উত্তেজনা প্রশমিত হলো। তিনি সাইদকে ছেড়ে দিলেন। উমর বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও। যদি এসব আয়াতের কোনো ভাবার্থ থাকে তাও তোমরা

আমাকে বলতে পার।"

ফাতিমা উমরের চেহারার এই পরিবর্তন দেখা স্বত্ত্বেও ভরসা করতে পারছিলেন না। তাই তিনি অস্বস্তি নিয়েই স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

উমর (রা) বোনের এই আচরণ দেখে বললেন, "তোমরা আমাকে যা পড়তে দিবে, আমি তা নষ্ট করব না, বরং আবার ফেরত দিব। যত খারাপই লাগুক, আমি তা নষ্ট করব না- এটা আমি ওয়াদা করলাম।"

ফাতিমা বললেন, "আচ্ছা, আপনাকে পড়তে দিচ্ছি। তবে তার আগে আপনাকে অযু করে পাক ও পবিত্র হতে হবে। পাক-পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর কালামকে স্পর্শ করা যায় না।"

উমর যখন অযু করতে গেলেন, তখন ভেতরের ঘর থেকে খাব্বাব (রা) বেরিয়ে এলেন। তিনি ফাতিমা ও সাইদকে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা তাকে সাহস করে পড়তে দিতে রাজি হলে, ভালো কথা। কিন্তু ওর মতো এতোটা উগ্র মেজাজের লোকের উপর এই ভরসা করাটা কি ঠিক হচ্ছে?"

ফাতিমা উত্তর দিলেন, "আমি আমার ভাইকে চিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়েত দান করবেন।"

তখনই উমর (রা) এর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। খাব্বাব (রা) আবার ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। ফাতিমা (রা) আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে কুরআনের আয়াত লেখা পাতাটিকে উমরের (রা) হাতে তুলে দিলেন।

হযরত উমর (রা) পড়তে শুরু করলেন,

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর; প্রজ্ঞাময়।

নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর

আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন।

তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়।

তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।

নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

তিনি রাত্রিকে দিনের মাঝে প্রবেশ করান আবার দিনকে রাত্রির মাঝে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সব কিছু জানেন।" (সূরা আল হাদীদ : আয়াত ১-৬)

এর আগে কুরআনের যে আয়াতগুলো হযরত উমর (রা) পড়েছেন বা শুনেছেন, কোনোবারই তিনি কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেননি। কুরআনের ভাষা তার কাছে বরাবরই অজানা বা বিদেশি ভাষার মতো মনে হতো। কিন্তু এবার তেলাওয়াত করে তিনি যেন ভালোভাবেই কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে ধারণ করতে পারলেন। তিনি সত্যকে বুঝতে পারলেন। শুধু তাই নয়, এবারই প্রথম উমর (রা) নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) প্রকৃতার্থেই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো দেব-দেবী যে কার্যকর নয়, তাও তিনি বুঝে গেলেন।

"আপনার দুর্ভোগ বাড়াবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।

বরং কুরআন তাদের হেদায়েতের জন্যই যারা তাঁকে ভয় করে।

এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূ-মণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।

তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন।

নভোমণ্ডলে, ভূ-মণ্ডলে এবং এর মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূ-গর্ভে যা আছে, তা সব তাঁরই। (সূরা ত্বোয়াহা : আয়াত- ২-৬)

"অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন। তখন আওয়াজ আসল, হে মূসা! আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে

ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ।

এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা নাজিল করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক।

আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।

কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মফল লাভ করে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খায়েশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সূরা ত্বোয়াহা : আয়াত ১১-১৬)

এ পর্যন্ত পড়েই হযরত উমর (রা) থেমে গেলেন। তিনি বললেন, "আমার আর পড়ার দরকার নেই। এক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করারই কোনো সুযোগ নেই। এই অন্যায্য কাজটি আমি এতো বছর তাহলে কিভাবে করলাম!! তোমরা বল, মুহাম্মাদকে (সা) কোথায় পাওয়া যাবে। আমি জলদি তার সাথে দেখা করতে চাই।" ফাতিমা এবং সাইদ (রা) তখনও সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। তারা উমরের (রা) মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারছিলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতরের ঘর থেকে হযরত খাব্বাবও (রা) বের হয়ে এলেন। তিনি সাইদকে (রা) উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ নবিজির (সা) সেই বিশেষ দোয়াটি কবুল করে নিয়েছেন?"

কিন্তু সাইদ (রা) তখনও নিশ্চুপ। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। এবার তিনি তার স্ত্রীর মুখপানে তাকালেন। এরপর তারা দুজন চোখের ইশারায় আলাপ করে সম্মতিতে পৌঁছলেন। তারা উমরকে (রা) বলে দিলেন যে, রাসূলকে (সা) এখন দারুল আরকামে (আরকামের বাসায়) পাওয়া যাবে। হযরত উমর (রা) তার উন্মুক্ত তলোয়ার খাপে ভরে এবার দীপ্ত পায়ে আরকামের বাসার দিকে অগ্রসর হলেন।

এদিকে দারুল আরকামে তখন নবিজি (সা) তার বেশ কিছু

সাহাবিকে নিয়ে একটি সদ্য নাজিল হওয়া সূরা তেলাওয়াত করছিলেন। অন্যদিকে হামজা এবং তালহা (রা) দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই উমর (রা) দরজায় কড়া নাড়লেন।

ভেতর থেকে তালহা প্রশ্ন করলেন, "কে ওখানে?"

উমর (রা) উত্তর দিলেন, "আমি উমর বিন খাত্তাব।"

নাম শুনেই ভেতরে উপস্থিত সবাই চমকে উঠল। উমর এখানে কেন? সে কি চায়? সে কি নির্যাতন করার জন্য এখান অবধি পৌঁছে গেছে? অনেকেই ভাবছিলেন, দরজা খোলা ঠিক হবে না। উমরকে (রা) এই ঘরে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত হবে না।

ঠিক তখনই হামজা (রা) কথা বলে উঠলেন। তিনি বললেন, "উমরকে (রা) ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদি তার নিয়ত ভালো থাকে, তিনি নিশ্চয়ই তাহলে ইসলাম গ্রহণ করতেই এসেছেন। আর যদি তার উদ্দেশ্য খারাপ থাকে, তাহলেই বা কি? আমরা এতোগুলো মানুষ এখানে আছি, তারা সবাই মিলে কি একজন উমরকে (রা) কাবু করতে পারব না!"

হামজার (রা) এই কথার পর তালহা (রা) গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। উমর (রা) ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই হামজা ও তালহা (রা) তার তলোয়ারটি নিয়ে নিলেন এবং উমরকে (রা) ধরে নবিজির (সা) কাছে নিয়ে গেলেন।

নবিজি (সা) উমরকে (রা) দেখেই, হামজা ও তালহা (রা) কে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। এমনকি নিজে উঠে দাঁড়িয়ে উমরের (রা) তলোয়ার তাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "চলে যাও।"

কিন্তু সিংহের ন্যায় সাহসী উমরের (রা) যেন কি হয়ে গেল সেদিন। তিনি এক পাও নাড়াতে পারছিলেন না। বরং নবি মুহাম্মাদের (সা) সামনে দাঁড়িয়ে তার সারা শরীর কাঁপছিল। তার শরীর থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছিল।

নবিজি (সা) উমরের (রা) কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "আল্লাহর লানত আসার আগেই সঠিক রাস্তায় ফিরে এসো উমর। ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নাও। হে আল্লাহ আপনি

উমরকে হেদায়েত দান করুন।"

উমর (রা) বিড়বিড় করে বললেন, "আমি বুঝাতে পারছি না আমার কি বলা উচিত, কি করা উচিত।"

এবার হামজা (রা) বললেন, "তুমি বল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

উমর (রা) এবার হামজার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর নবিজির (সা) পবিত্র মুখপানে তাকিয়ে তিনি কালেমা পড়লেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, প্রভু নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) তার বান্দা ও রাসূল।"

উমরের (রা) কালিমা পাঠ করার সময় গোটা ঘরে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। কালিমা পড়া শেষ হলে সাহাবিরা আর নিজেদের সংবরণ করতে পারলেন না। তারা চিৎকার করে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ মহান। তাদের চিৎকার এতোটাই উচ্চস্বরে ছিল যে মক্কার অনেক অলিগলি থেকেও সেই শব্দ শোনা গেল। হযরত উমর (রা) তখন ঈমানের স্বাদ পাওয়ার তাজা অনুভূতিতে এতোটাই আবেগতাড়িত ছিলেন যে তিনিও অন্য সব সাহাবিদের মতোই উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিতে লাগলেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

এরপর থেকে হযরত উমর (রা) এতোদিন যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিজের যাবতীয় সাহস, বীরত্ব আর শক্তি সামর্থ্যকে কাজে লাগাচ্ছিলেন ঠিক সেভাবেই ইসলামের পক্ষে, ইসলামী শক্তির অনুকূলেই তিনি নিজের যাবতীয় সাহস, বীরত্ব আর শক্তি সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে শুরু করেন। এর আগে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার ছিলেন, একইভাবে তিনি ইসলামের পক্ষে তার আওয়াজ জোরালো করলেন।

উমর (রা) প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা), বিপদের আশঙ্কায় আমরা আর কতদিন চুপ থাকব?"

রাসূল (সা) উত্তর দিলেন, "আর নীরবতা নয়। এখন সময় এসেছে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়ার। কাবায় গিয়ে নামাজ আদায়

করার।"

উমর (রা) এবার উপস্থিত অন্যান্য সাহাবিদের মুখপানে চেয়ে বললেন, "চলুন, আমরা তাহলে প্রকাশ্যে কাবায় যাই এবং সবার সামনে আত্মবিশ্বাসের সাথে নামাজ আদায় করি। এখন যেহেতু উমর আপনাদের সাথে যাবে তাই আর কাউকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।"

রাসূল (সা) নিজেও মৃদু হেসে উমরের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলেন।

আরকামের বাসা থেকে বের হয়ে মুসলমানেরা দুটি দলে ভাগ হলেন। একটি দলের নেতৃত্বে থাকলেন হযরত উমর (রা) আর অন্য দলটির নেতৃত্বে থাকলেন হযরত হামজা (রা)। এরপর রাজপথ দিয়ে হেঁটে দীপ্ত পায়ে তারা কাবার পথে এগোতে শুরু করলেন। পথিমধ্যে যারাই তাদের দেখছিলেন, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ছিলেন। উমর (রা) এর নেতৃত্বে মুসলমানেরা কাবায় গিয়ে নামাজ শুরু করে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর অন্য সবার চেয়ে উমর (রা) যেন একটু বেশিই লজ্জিত অবস্থায় ছিলেন। নামাজেও তিনি অনেক বেশি কান্নাকাটি করতেন। অতীত জীবনে তিনি সত্য পথের পথিক মুসলমানদের উপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছেন, তার কথা ভেবেই তিনি লজ্জিত হতেন। আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তির আশায় নিরবে চোখের পানি ফেলতেন। তার মনে হলো, তার পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার একটা মাত্র উপায় আছে। আর তাহলো তাকেও ঠিক সেভাবেই নির্যাতিত হতে হবে, যেভাবে তিনি এর আগে মুসলমানদের নির্যাতন করেছেন। কিন্তু তাকে তো মক্কার অধিকাংশ মানুষ ভয় পায়। কে তাকে সেইভাবে নির্যাতন করবে, কেই বা তাকে রক্তাক্ত করবে?

তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও অনুশোচনা থেকে বাঁচার জন্য একটা পর্যায়ে উমর (রা) সময়ের সবচেয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবলেন, ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু যে, তার সামনে দাঁড়িয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেবেন। পরের দিন তিনি সরাসরি চলে গেলেন কুরাইশ নেতা আবু জেহেলের বাসায়। আবু জেহেলের চোখের

দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছি এবং ইসলামকে প্রকৃত সত্য ধর্ম হিসেবে কবুল করেছি।"

উমরের (রা) মুখ থেকে সরাসরি এই কথা শুনে আবু জেহেল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না যে কি বলবে। সে একবার ভাবছিল, উমর বোধ হয় নেশা করেছে বা উমরের বোধ হয় মানসিক কোনো সমস্যা হয়েছে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আবু জেহেল বলল, "আসলেই উমর? তুমি যা বললে তা কি সত্যি?"

উমর (রা) বললেন, "হ্যাঁ সত্যি।" উমর (রা) ততক্ষণে আবু জেহেলকে মোকাবেলা করার মতো প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছেন।

কিন্তু আবু জেহেল কোনো ধরনের আঘাত করার বা ধমক দেয়ার অবস্থায় ছিল না। উমরের (রা) ইসলাম কবুলের বিষয়টা তাকে রীতিমতো হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে। কোনো রকমে খুব ধীর কণ্ঠে আবু জেহেল শুধু বলল, "উমর, অন্তত তুমি এমনটা কর না।"

উমর (রা) বলিষ্ঠভাবে উত্তর দিলেন, "আমি এক মুহূর্তের জন্যও ইসলাম ত্যাগ করব না।"

উমরের (রা) এই দৃঢ়তা দেখে আবু জেহেল রাগে, ক্ষোভে ফেটে পড়ল। সেও উমরকে (রা) অনেক বেশি ভয় পেতো আর তাই উমরের সাথে কোনো ধরনের তর্কে না জড়িয়ে আবু জেহেল ঘরের ভেতর চলে গেল ।

উমর (রা) নিজেও আবু জেহেলের ভূমিকায় বিস্মিত হলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, ইসলামের এই শত্রু তার ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে ভীষণ ক্ষেপে যাবে। হয়তো তাকে মারতেও আসবে। তিনি তো আঘাত পাওয়ার জন্যই এখানে এসেছিলেন। কিন্তু এতোটা সহজে, কোনো ধরনের বাজে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়েই সে কেটে পড়বে, উমর (রা) তা ভাবেননি।

আবু জেহেলের বাসা থেকে বের হয়ে উমর (রা) আরো দুজন কুরাইশ নেতার বাসায় গেলেন। এই দুজনও তাকে কোনো প্রতিক্রিয়া

দেখাতে সাহস পেল না। একজন ভাবল উমর (রা) বোধ হয় মাতাল হয়ে আছে তাই সে কোনো ধরনের তর্কে জড়ালো না। আর অন্যজন উমরের (রা) ভয়ে প্রসঙ্গই পাল্টে ফেলল। উমরের সাথে ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে কোনো ঝগড়া তো দূরের কথা, কোনো ধরনের আলোচনাও সে করল না।

কুরাইশ নেতাদের এই ধরনের দুর্বল প্রতিক্রিয়ায় উমর (রা) নিজে বেশ অবাক হলেন। তিনি যেভাবে নির্যাতন ভোগ করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, সেই উদ্দেশ্যও পূরণ হচ্ছিল না।

হযরত উমরকে (রা) এভাবে বাড়িতে বাড়িতে যেতে দেখে একজন শুভাকাঙ্খি তাকে বেশ মজার একটি পরামর্শ দিল। তিনি বললেন, "উমর, এভাবে আপনি কয়জনের বাসায় গিয়ে আপনার ইসলাম গ্রহণের খবরটি জানাবেন। আপনি যদি সবাইকে জানাতেই চান, তাহলে জামিল বিন মুয়াম্মিরের কাছে যান। সে গুজব বা তথ্য ছড়িয়ে দিতে খুবই পারদর্শী। তাকে গিয়ে এই চাঞ্চল্যকর খবরটি জানালে সে নিজেই নিজ দায়িত্বে অন্যদের তথ্যটি জানিয়ে দেবে।"

উমরের (রা) এই পরামর্শটা বেশ পছন্দ হলো। তিনি জামিলের কাছে গিয়ে কথাটা জানালেন। স্বভাবজাত কারণে জামিলও আর দেরি করল না। সে মক্কার লোকারণ্য একটি স্থানে গিয়ে ঘোষণা করল, "শোন সবাই, খাত্তাবের ছেলে উমর পাগল হয়ে গেছে।"

কিন্তু হযরত উমর (রা) তো এ ধরনের কোনো নেতিবাচক প্রচারণা চাননি। তাই তিনি জামিলকে ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে নিজেই একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সবাইকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বললেন, "ও মিথ্যা কথা বলছে। এবার আমার মুখ থেকেই সত্যটা শুনুন। আমি উমর, খাত্তাবের ছেলে উমর, প্রকাশ্যে এবং ঠাণ্ডা মাথায় ঘোষণা দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তার বান্দা ও রাসূল।"

উমরের (রা) ঘোষণা শুনে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে পড়ল। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, গতকাল পর্যন্ত যে মানুষ ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল, একদিনের মাথায় সে-ই ইসলামের পক্ষে

এভাবে অবস্থান নেবে। আর যারা বেশি বেপরোয়া, তারা উমরের (রা) এই ঘোষণাকে মানতে পারল না। উমরের (রা) সাহস ও বীরত্বের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা গিয়ে উমরের (রা) উপর উপর্যুপরি আঘাত হানতে শুরু করল। আঘাতে আঘাতে হযরত উমর (রা) রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন।

হযরত উমর (রা) এই পরিণতিটাই চাইছিলেন। একের পর এক মানুষ এসে তাকে আঘাত করছিল। তার শরীরের যন্ত্রনা ও ব্যথা বাড়ছিল, আর তিনি গুনাহ মাফের স্বস্তি অনুভব করছিলেন। মার খেতে খেতে উমর (রা) অনেকটাই বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তখন কুরাইশ সদস্যরা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল।

এভাবেই ইসলামের এক সময়ের শত্রু হযরত উমর (রা) আল্লাহ তায়ালার রহমত ও হেদায়েতের বদৌলতে অবশেষে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হলেন। ইসলামের মাঝে তিনি শান্তির পরশ খুঁজে পেলেন।

সাহসী এক কিশোরের গল্প

রাসূলের (সা) সাথে হযরত আলীর (রা) সম্পর্কের সূচনা

রাসূলের (সা) প্রিয় চাচা ছিলেন আবু তালিব। তিনি পরম স্নেহে নবি মুহাম্মাদ (সা) কে লালন পালন করেছিলেন। রাসূল (সা) তার জন্মের আগেই পিতা আব্দুল্লাহকে হারান। মাত্র ছয় বছর বয়সে তার মা আমিনাও ইন্তেকাল করেন। এরপর সেই ছয় বছর বয়স থেকেই নবি মুহাম্মাদ (সা) তার চাচা আবু তালিবের বাসায় বসবাস করতেন। যতদিন তিনি চাচা আবু তালিবের বাসায় ছিলেন ততদিন চাচা আবু তালিব তাকে নিজের ছেলের মতো পরম মমতায় লালন করতেন। একজন পিতা তার সন্তানকে যেভাবে ভালোবাসতে পারে, চাচা আবু তালিব ঠিক সেভাবেই নবি মুহাম্মাদকে (সা) ভালোবাসতেন। রাসূল (সা) নিজেও চাচা আবু তালিবকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন এবং

শ্রদ্ধা করতেন। বিবি খাদিজাকে বিয়ে করার আগ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা) তার চাচা আবু তালিবের সাথেই থাকতেন।

চাচা আবু তালিবের বাসায় থাকা অবস্থায় যখন তার একজন সন্তান হলো তখন নবিজি খুব খুশি হয়েছিলেন। তাঁর উচ্ছ্বাস দেখে মনে হতো সন্তানটি চাচা আবু তালিবের নয় বরং তাঁর নিজেরই। আবু তালিবের কোল আলো করে যখন নতুন এই সন্তানটি আসে রাসূল (সা) তখন বাসার বাইরে ছিলেন। নতুন সন্তান আগমনের খবর পেয়েই তিনি দ্রুত চাচার বাসায় চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন ছোট্ট শিশুটি তার মায়ের কোলে আপন মনে শুয়ে আছে। একেবারে জন্মের পর থেকেই ছোট্ট এই শিশুর দৃষ্টি ছিল পরিষ্কার ও অন্তর্ভেদি। শিশুটি দেখতেও ছিল খুবই সুন্দর। রাসূল (সা) ছোট্ট শিশুকে তার কোলে তুলে নিলেন এবং কপালে আদর মাখা চুমু দিলেন। তিনি চাচাকে প্রশ্ন করলেন,"চাচা এই বাচ্চাটির নাম কী রাখবেন?"

চাচা বললেন, "ওর নাম রাখব আলী।"

এরপর থেকে দিন যত যেতে লাগল, আলীর (রা) প্রতি নবি মুহাম্মাদের (সা) ভালোবাসাও ক্রমশ বাড়তে লাগল। এই ভালোবাসার মাত্রা এতোটাই প্রকট ছিল যে একদিন নবি মুহাম্মাদ (সা) চাচা আবু তালিবের কাছে গেলেন এবং বললেন, "চাচা, আমি জানি আপনি আমাকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসার দাবি থেকে আমি আপনার কাছে আজ একটা কিছু চাইব।"

চাচা আবু তালিব জানতে চাইলেন, "বল তুমি কি চাও?"

নবিজি (সা) বললেন, "দয়া করে আলীকে আমার জিম্মায় দিয়ে দিন। আলী আজ থেকে আমার বাসায় থাকবে।"

চাচা আবু তালিব নবি মুহাম্মাদকে (সা) এতোটাই ভালোবাসতেন যে তার অনুরোধ তিনি ফেলতে পারলেন না। আলী (রা) এরপর থেকে বাবা আবু তালিবের বাসা ছেড়ে তার চাচাতো ভাই, আমাদের শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর বাসায় থাকতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে রাসূলের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজেই আলী (রা) ছায়ার মতো তাকে সঙ্গ দিয়ে যান।

হযরত আলী (রা) যেভাবে মুসলমান হলেন

হযরত আলীর তখন মাত্র ১০ বছর বয়স। একদিন তিনি বাড়িতে ফিরে বেশ অদ্ভুত একটা দৃশ্য লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা) সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার দৃষ্টি মাটির দিকে অবনমিত। আর হাত দুটো তিনি বুকের উপরে বেঁধে রেখেছেন। তার স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা) একইভাবে নবি মুহাম্মাদের (সা) পাশে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠভাবে স্বামীকে অনুসরণ করছেন।

কিছু সময় পর, মুহাম্মাদ (সা) এবং খাদিজা (রা) হাটুর উপর হাত রেখে মাথা ঝুঁকে রুকুতে চলে গেলেন। তারা কিছুক্ষণ সে অবস্থানে থাকলেন তারপর আবার আগের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। দূর থেকে কিশোর আলী (রা) গভীর মনোযোগের সাথে এসব দৃশ্য দেখছিলেন। ভাই ও ভাবির কার্যক্রমে তিনি বেশ অবাকও হয়েছিলেন। একটু পর তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে, নবি মুহাম্মাদ (সা) ও বিবি খাদিজা (রা) হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং তারপরে কপাল মাটিতে ছোঁয়ালেন যাকে আমরা এখন সিজদা বলি। এই কার্যক্রমগুলো তখনো পর্যন্ত আলীর (রা) কাছে অপরিচিত হওয়ায় তার বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটছিলই না। তিনি আরো ভাবলেন, "আমি এর আগে আমাদের মাটির তৈরি দেব-দেবীর মূর্তির সামনে কাউকে কাউকে মাথা নিচু করে উপাসনা করতে দেখেছি। কিন্তু মোহাম্মাদ (সা) বা খাদিজার (রা) সামনে তো সেরকম কোনো মূর্তি নেই। তার মানে তারা কোনো দেব দেবীর বা প্রতিমার পূজা করছে না বরং তারা অন্য কারো ইবাদত করছে।"

কিশোর আলী ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। যদিও নিশ্চিতভাবে তিনি বুঝেননি নবি মুহাম্মাদ (সা) এবং তার স্ত্রী খাদিজা (রা) কি কাজ করছেন। তবে তিনি ধারণা করেছিলেন যে তারা হয়তো কারো ইবাদত করছেন। তিনি এও বুঝে ফেললেন যে, তার ভাই ও ভাবি এমন একজনের ইবাদত করছে যার কোনো প্রতিমা তাদের সামনে উপস্থিত নেই। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) কোনো এক স্বত্ত্বাকে না

দেখে তার ইবাদত করছে। এই ঘটনাগুলো দেখে হযরত আলীর (রা) মনে অদৃশ্য প্রভু সম্বন্ধে জানার বিপুল আগ্রহ তৈরি হলো।

যখন নবি মুহাম্মাদ (সা) তার ইবাদত শেষ করলেন, কিশোর আলী (রা) তার কাছে ছুটে গিয়ে জানতে চাইল, "আপনি এতোক্ষণ কি করছিলেন?"

হযরত আলীর (রা) এই কৌতুহল দেখে নবি মুহাম্মাদ (সা) ভীষণ সন্তুষ্ট হলেন। মৃদু হেসে তিনি বললেন, "প্রিয় ভাই, আমি আর খাদিজা উভয়ে মিলে আল্লাহর ইবাদত করছিলাম। আল্লাহ হলেন একমাত্র মাবুদ। আল্লাহ একক এবং তিনিই একমাত্র সত্যিকারের প্রভু। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, আর কোনো ইলাহ নাই। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে তাঁর রাসূল হিসেবে বাছাই করেছেন। তিনি আমাকে তাঁর বার্তাগুলো অন্য সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। এখন আমাকে সর্বস্তরের জনগণকে জানাতে হবে যে, তোমরা যাদের ইবাদত করছ তারা সব মিথ্যা এবং কৃত্রিমভাবে তৈরি। এই সকল মিথ্যা দেব-দেবী আর প্রতিমা পূজা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কেননা তিনিই প্রকৃত এবং সত্যিকারের প্রভু।"

এতোটুকু বলে নবি মুহাম্মাদ তীক্ষ্ণভাবে আলীর (রা) চোখের দিকে চোখ রাখলেন। তিনি বললেন, "আলী তুমি জানো, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। আমি নিজের ছেলের মতোই তোমাকে মানুষ করছি। আমি তোমার সাথে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলিনি। তোমার সাথে আমি কখনো প্রতারণা করিনি। তোমার এখন বিশ্বাস করা উচিত এইমাত্র আমি তোমাকে যা কিছুই বলেছি তার সবটাই সত্য। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই আর আল্লাহই আমাকে তাঁর রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন।"

হযরত আলী (রা) নিজেও জানতেন, হযরত মুহাম্মাদের (সা) প্রতিটি কথাই সত্য। তিনি নবিজির (সা) প্রতিটি কথাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করলেন। তিনি রাসূলের (সা) কথায় ঈমান আনলেন। ইসলামকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করায় নবি করীম (সা) হযরত আলীর (রা)

উপর খুব খুশি হলেন। তিনি কিশোর আলীকে (রা) সত্যনিষ্ঠ ধর্মের পতাকাতলে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, "তোমাকে অভিনন্দন আলী। তুমি জানো, তোমার অন্তর জানে যে, আমি যা বলেছি তা সত্য ও সঠিক। আর তুমি হলে প্রথম কিশোর যে ইসলামকে কবুল করে নিয়েছে।"

আলীকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বাবা আবু তালিব

এক দিনের কথা। হযরত আলী (রা) তাঁর প্রিয় রাসূলের (সা) সাথে মক্কার একটি পাহাড়ের পাদদেশে গোপনে নামাজ পড়ছিলেন। এ সময় তাদের সাথে আরো বেশ কয়েকজন নওমুসলিম সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। তারা একই সাথে জামাতে নামাজ পড়ছিলেন। ঠিক তখনই হযরত আলীর (রা) বাবা আবু তালিব সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি মূলত তার ছেলে আলীকে (রা) খুঁজতে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। আবু তালিবের তখন বেশ বয়স হয়ে গেছে। তিনি কিশোর ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে যখন তিনি দেখলেন তার ভাতিজা নবি মুহাম্মাদ (সা) এবং ছেলে আলী (রা) আরো অনেকের সাথে মিলে ইবাদত করছে তখন তিনি বেশ হতবাক হয়ে গেলেন। এর আগে আর কাউকে তিনি এভাবে ইবাদত করতে দেখেননি। ফলে গোটা দৃশ্যপট তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল।

আবু তালিব বেশ খানিকটা সময় অপেক্ষা করলেন। নামাজ শেষ হওয়ার পর তিনি তাদের কাছে গেলেন। ভাতিজা নবি মুহাম্মাদের (সা) সাথে তার কিছু কথোপকথনও হলো- যা নিম্নরূপ:

আবু তালিব : মুহাম্মাদ, তুমি এগুলো কি করছ?

নবিজি (সা) : চাচা, আমরা নামাজ পড়ছি।

আবু তালিব : তোমরা কার সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছ? কার সামনে ইবাদত করছ? আমি তো তোমাদের সামনে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

রাসূল (সা) : আমরা যখন নামাজ পড়ি, তখন আমাদের সামনে আল্লাহর কোনো পাথরে বানানো মূর্তি থাকার প্রয়োজন হয় না।

আবু তালিব : তাহলে তোমরা কার ইবাদত কর?

নবিজি (সা) : আমরা এই বিশ্ব জাহানের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করি।

আবু তালিব : কেন তোমরা তার ইবাদত কর? কোথা থেকে তোমরা এই বার্তা পেয়েছো?

নবিজি (সা) : কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাকে রাসূল হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আসুন চাচা আপনি আমাদের সাথে এসে দাঁড়ান, নামাজে শামিল হউন।

আবু তালিব : কিভাবে আমি তোমাদের সাথে নামাজ পড়ব? আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। আমি এই বয়সে এসে তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারি না। আমি আমার গোত্রের মানুষদের এতো দিনের পালন করে আসা ধর্মকে, আমাদের পূর্বসূরীদের ধর্মকে এভাবে ত্যাগ করতে পারব না।

রাসূল (সা) পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু চাচা আপনি কি এটা বুঝতে পারছেন না যে এটাই আমাদের আদিপুরুষ হযরত ইবরাহিমের (আ) সুপারিশকৃত সত্য ধর্ম।"

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে আবু তালিব তার ছেলে আলীর (রা) কাছে চলে গেলেন। হযরত আলী তখন অন্যান্য মুসলিম সাহাবিদের সাথে একটি কোনায় দাঁড়িয়েছিলেন। আবু তালিব তার ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, "বাবা তুমি এখানে কি করছ? তুমিও কি মুহাম্মাদের মতো আমাদের পূর্বসূরীদের ধর্মকে ত্যাগ করেছ?"

হযরত আলী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে মুসলমান হিসেবে বাছাই করেছেন। আমি এক আল্লাহর ইবাদত করি আর আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মাদের (সা) অনুসরণ করি।"

হযরত আলীর (রা) উত্তর শুনে পিতা আবু তালিব উদ্বিগ্ন হয়ে

পড়লেন। তার মনে হলো তার এই ছেলেটি বোধহয় উচ্ছন্নে চলে যাবে। পাশাপাশি, তার ছেলে পূর্বসূরীদের ধর্মকে ত্যাগ করেছে এই বিষয়টিও আবু তালিবকে অনেক ব্যথিত করল।

তিনি হযরত আলীকে (রা) ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব করলেন। তিনি কিশোর সন্তান আলীকে (রা) বললেন, "তোমার আর মুহাম্মাদের (সা) সাথে থাকার দরকার নেই। আজ থেকে তুমি আমার সাথে আমার বাসায় থাকবে।"

হযরত আলী (রা) তার বাবা আবু তালিবকে অত্যন্ত পছন্দ করলেও বাবার এই আদেশটি মানতে রাজি হলেন না। আবু তালিব আবারও অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তখন নবি মুহাম্মাদ (সা) হযরত আলীর (রা) কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, "আমার দিক থেকে কোনো চাপ নেই। তুমি তোমার মতো করে স্বাধীনভাবে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারো। যদি তুমি তোমার বাবার সাথে থাকতে চাও তাহলে আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই।"

কিন্তু হযরত আলী (রা) স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের (সা) সাথে থাকতে চাই। আমি তার কাছে থেকেই আল্লাহর ইবাদত করতে চাই।"

তাই বাধ্য হয়েই আবু তালিব তার কিশোর সন্তান আলীকে (রা) নবি মুহাম্মাদের (সা) কাছে রেখে চলে গেলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে তিনি কি করবেন। একদিকে তিনি বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন কেননা আলী তার বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে কিন্তু তিনি এও জানতেন যে নবি মুহাম্মাদ (সা) একজন ভালো, সৎ, বিশ্বস্ত এবং আমানতদার মানুষ। বিদায় বেলায় চাচা আবু তালিব নবি মুহাম্মাদকে (সা) বলে গেলেন, "যদিও আমি তোমার ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না। এ সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণাও নেই। তারপরও আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি, তুমি কখনোই আলীকে খারাপ কোনো কাজে লাগাবে না, খারাপ কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে না। তোমার উপরে অন্তত এতোটুকু বিশ্বাস আমার আছে।"

পরিণত বয়সে হযরত আলী (রা)

কিশোর হিসেবে হযরত আলী (রা) খুবই ভালো ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ালু এবং সুবিবেচক। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। তখন হযরত আলীর (রা) বয়স ১১ বছর। রাসূল (সা) আলীকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "আলী, আমি আমার পরিবারের মুরব্বিদের একদিন দাওয়াত করে খাওয়াতে চাই। আমি চাই তুমি গোটা আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব নাও। তুমি সকল অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাবে এবং পরবর্তী বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করবে।"

হযরত আলী (রা) এই দায়িত্ব পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তার এই ভেবে ভালো লাগল যে, গোটা নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার রাসূল (সা) তার উপর ন্যস্ত করেছেন। দায়িত্বের অংশ হিসেবে হযরত আলী (রা) পরিবারের সকল মুরব্বির কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিলেন এবং খাবার প্রস্তুতি ও রান্নাবান্নার যাবতীয় কাজ তদারকি করলেন।

পরিবারের নিমন্ত্রিত সকল সদস্যগণ দাওয়াতে আসলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন আবু লাহাব যিনি সম্পর্কে রাসূলের (সা) চাচা হন। মানুষ হিসেবে আবু লাহাব ছিলো নিতান্তই বাজে স্বভাবের। গোটা জীবন জুড়ে সে শুধু অর্থ-সম্পদের পেছনেই ছুটেছে। সে সম্পদ বাড়ানোর জন্য যে কোনো কিছু করতে দ্বিধা করত না। আবু লাহাব অহরহ মিথ্যা বলতো। সে অভাবী ও দরিদ্রদের সাথে প্রতারণা করত এবং অসহায় মানুষের উপর নির্যাতন চালাত। আবু লাহাব পৃথিবীতে শুধু একটি জিনিসই পছন্দ করত আর তাহলো সম্পদ আর বিত্ত-বৈভব।

অন্য সকল মুরব্বির মতো আবু লাহাবও পাথরের তৈরি মূর্তির উপাসনা করত। সে কখনোই আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মানতে চায় নি। সে ভেবেছিল, "যদি আমি মুসলমান হই তাহলে আমার সম্পদের একটা অংশ অভাবী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দিয়ে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ এরকমই আদেশ করেছেন। তাছাড়া আমি যদি মুসলমান হই তাহলে তো আমাকে সৎ হয়ে যেতে হবে। আর সৎ হয়ে গেলে আমি

তো আর মিথ্যা কথা বলে কিংবা প্রতারণা করে অর্থ-সম্পদ বানাতে পারব না।"

আগত সকল মুরুব্বির খাবার গ্রহণ শেষ হওয়ার পর রাসূল (সা) আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন। নবিজির (সা) ইচ্ছে ছিল তিনি উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দিবেন যে, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন সত্যিকারের প্রভু এবং তিনি আল্লাহর রাসূল। নবিজি (সা) আরো চেয়েছিলেন যে, তিনি তার সকল মুরুব্বিকে অনুরোধ করবেন যাতে তারা মাটি আর পাথরে তৈরি দেব-দেবীর উপাসনা না করে বরং এক আল্লাহর ইবাদত শুরু করেন।

কিন্তু যখনই মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন তখনই আবু লাহাব তাকে থামিয়ে দিলেন। যদিও সম্পর্কে মুহাম্মাদ (সা) তার ভাতিজা হন তবুও আবু লাহাব তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। আবু লাহাব এও চাননি যে, দাওয়াতে উপস্থিত অন্য কেউ মুহাম্মাদের কথা শুনুক। আয়োজন ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে আবু লাহাব এতো জোরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল যে নবিজিকে (সা) বাধ্য হয়ে থেমে যেতে হলো। রাসূল (সা) যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলেন সেগুলো আর বলা হলো না এবং অতিথিরাও সেই কথাগুলো না শুনেই সেদিনের মতো চলে গেল।

এভাবে সব মেহমান চলে যাওয়ায় হযরত আলী (রা) বেশ কষ্ট পেলেন। বিশেষ করে, আবু লাহাবের উপর তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। আলী (রা) ভাবতেও পারেননি যে তার পরিবারের মুরুব্বিরা এই ধরনের বাজে ব্যবহার করতে পারে। হযরত আলীর (রা) মলিন চেহারা দেখে রাসূল (সা) তার কাছে গেলেন আর বললেন, "আলী, এতো সহজেই হাল ছেড়ে দিও না। তুমি দেখো নিকট ভবিষ্যতে আমরাই জয়ী হবো কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহায্য করবেন। আমি তোমাকে অনুরোধ করব যাতে তুমি একই ধরনের আরেকটি দাওয়াতের ব্যবস্থা কর। আজকে যা হলো পরবর্তী অনুষ্ঠানে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয় আমি তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করব।"

হযরত আলী (রা) এবারও রাসূলের (সা) কথামতো যাবতীয়

ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। পরিবারের সকল মুরুব্বিরা আবারও দাওয়াত খেতে উপস্থিত হলেন। খাবার-দাবার গ্রহণের পর হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর পরিকল্পনামাফিক আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন। তবে এবার আবু লাহাব তাকে আর বাঁধা দিল না। রাসূল (সা) বললেন, "আমার প্রিয় বন্ধুগণ। আমি এখানে আমাদের সকলের প্রভুর পক্ষ থেকে কিছু বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছি। একমাত্র আল্লাহই হলেন এ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, একমাত্র মালিক। তিনি আমাকে তাঁর রাসূল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি আমাকে আপনাদের মাঝে পাঠিয়েছেন যাতে আমি আপনাদের কিছু কথা জানাতে পারি। যাতে আমি আপনাদের হেদায়াতের সন্ধান দিতে পারি যার মাধ্যমে আপনারা দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভ করবেন। এবার দয়া করে, পবিত্র কালামে পাক থেকে আল্লাহ তায়ালার কিছু ঘোষণা শুনুন। আল্লাহ বলেন,

"আমি একমাত্র প্রতিপালক, ইলাহ। এই বিশ্বজাহানের অধিপতি।
তোমরা আমাকে সবসময় স্মরণ করবে।
আমাকে ভালোবাসবে, আমার ইবাদত করবে।
আমার হক আদায় করবে, আমার আনুগত্য করবে।
আমার সামনেই শুধু সিজদা করবে।
যদি তোমরা এই কাজগুলো করতে পার,
তাহলেই আমি তোমাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হব।

আর আমিও তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হব কেননা আমি তোমাদের ভালোবাসি, তোমাদের নিয়ে আমিও সচেতন থাকি। যদি তোমরা আমার কথামতো চলো, আমি তোমাদের উদারভাবে পুরস্কৃত করব। তোমাদেরকে অপয়া থেকে হেফাজত করে জান্নাতে প্রবেশ করাব- যেখানে কোনো ভয় নেই, কোনো কিছু নিয়েই যেখানে তোমাদের কোনো আফসোস বা অনুশোচনারও স্থান নেই।"

এটুকু বলেই রাসূল (সা) থামলেন এবং বললেন, "আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ কথাগুলো জানানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ, দয়া করে বলুন, আপনাদের মধ্যে কারা কারা আমার সাথে

থাকবেন এবং আল্লাহর হক আদায় করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করবেন? কে কে আছেন যারা আমাকে অনুসরণ করবেন? এই মহৎ কাজে কারা কারা আমার সঙ্গী হবেন?"

কেউ কোনো কথা বলল না। যদিও মুরুব্বিরা সবাই পরিষ্কারভাবে নবি মুহাম্মাদের (সা) এর সকল কথা শুনেছেন তবুও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো না। বরং রাসূল (সা) যখন তাদের মুখের দিকে তাকালেন তারা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখেও হযরত আলী (রা) বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হযরত আলী (রা) ভালোমতো জানতেন এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, রাসূল (সা) যা বলেছেন তার প্রতিটি কথাই সত্য। তারপরও তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে কেন মুরুব্বিরা নবিজির (সা) কথায় বিশ্বাস আনতে পারলেন না। হযরত আলী (রা) ভাবলেন, এই লোকগুলো আসলে বিপথগামী এবং আল্লাহ হেদায়েত না করলে তারা কেউ সঠিক পথে ফিরে আসতে পারবে না।

এরপর হযরত আলী (রা) রাসূলের মুখপানে তাকালেন। তিনি তখনও পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছেন কেউ হয়তো তার ডাকে সাড়া দেবেন। হযরত আলী (রা) এই পিন পতন নীরবতাকে আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি এতোক্ষণ বসে ছিলেন। হঠাৎ করে তিনি উঠে দাড়াঁলেন এবং দ্রুতবেগে মুরব্বিদের মাঝখানে হেটে গিয়ে একেবারে রাসূলের (সা) পাশে গিয়ে থামলেন।

হযরত আলী (রা) নবি মুহাম্মাদের (সা) চোখ মুবারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে অনুসরণ করব, আমি আপনার সঙ্গী হব এবং আমি আপনাকে সাহায্য করব। যদিও আমি বয়সে তরুণ এবং খুব একটা শক্তিশালীও নই। তবুও আমি আপনার পক্ষে লড়াই করে যাব। আজ থেকে আপনার যারা বিরোধিতা করবে আমিও তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেব।"

মুরুব্বিরা হযরত আলীর (রাঃ) ভূমিকায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তারা কি করবেন বা বলবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিভাবে আলীর মতো সামান্য একজন কিশোর নবি মুহাম্মাদের (সা)

পক্ষে অবস্থান নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে। কিন্তু হযরত আলী (রা) ছিলেন খুব সাহসী। আল্লাহর উপর তার ছিল পূর্ণ ঈমান ও আস্থা। তিনি ভালোভাবে জানতেন যে, আল্লাহ তাকে এবং তাঁর প্রিয় রাসূলকে (সা) সাহায্য করবেন। তিনি এও বিশ্বাস করতেন খুব শীঘ্রই তারা বিজয় লাভ করবেন।

হযরত আলীর (রা) তড়িৎকর্মা প্রতিক্রিয়ায় এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে নবি মুহাম্মাদ (সা) খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, "এখানে এতোগুলো বয়স্ক মানুষেরা যা করতে সাহস পায়নি, এই কিশোর ছেলেটি তাই করে দেখালো। আমি আলীকে আমার অনুসরণকারী এবং সঙ্গী হিসেবে স্বাগত জানাই। আপনাদের উচিত আলীর মতো করে বিষয়টিকে নিয়ে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করা এবং আলীর (রা) মতোই সঠিক পথে চলে আসা।"

নবিজি (সা) এটুকু বলে হযরত আলীর (রা) মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আবু লাহাব এই দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। সে এতোক্ষণ নীরবে চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু যখন অন্য সব মুরুব্বির কাপুরুষোচিত আচরণের মুখে হযরত আলী (রা) সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন, তখন আবু লাহাব আর সহ্য করতে পারল না। সে আবার আগের দিনের মতো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল এবং একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করল। আবু লাহাব উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, "ও আমার ভাইয়েরা, কিভাবে একজন পরিণত মানুষ আর একটা কিশোর ছেলে মিলে গোটা পৃথিবীকে পাল্টে দেবে? কিভাবে তারা হাজার হাজার অনুসারী তৈরি করবে? এটা কোনো দিনই সম্ভব নয়।"

কিন্তু আবু লাহাবের কথা ঠিক হয়নি। বরং অল্প কয়েক বছরের মাঝেই শুধু মক্কা বা মদিনা নয়, আশপাশের সকল দেশ এবং অঞ্চলের মানুষ আল্লাহর রাসূলের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে শুরু করে। ইসলামের পতাকাবাহী সেনারা আবু লাহাবের নিয়ন্ত্রণাধীন মক্কা শহরকে জয় করে নেয় আর আবু লাহাবের স্থান হয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।

সাহসী পদক্ষেপ

রাসূল (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর বেশ বড় একটা সময় ধরে নিরন্তরভাবে চেষ্টা করে গেছেন যাতে মক্কার বাসিন্দাদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করা যায়। প্রতিদিন সকালে তিনি ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতেন। বিভিন্ন জনাকীর্ণ স্থানে, পাবলিক প্লেসে কিংবা নানা জনের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি তাদের বুঝাতে চেষ্টা করতেন যে, একমাত্র আল্লাহই বিশ্বজগতের অধিপতি, মানুষের একমাত্র প্রভু। কেউ কেউ নবি মুহাম্মাদের (সা) কথা বিশ্বাস করত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। তারা আল্লাহর ইবাদত করত এবং রাসূলকে (সা) অনেক বেশি বিশ্বাস করত। কিন্তু দীর্ঘ এই সময় ধরে মক্কায় দাওয়াতি কাজ চালানোর পরও হাতে গোনা খুব কম সংখ্যক লোকই ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়েছিল।

মক্কার অধিকাংশ লোকই রাসূলের (সা) উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল। তারা তাদের নিজেদের লোভ-লালসায় মত্ত ছিল। নিজস্ব হিসেবেই তারা জীবন যাপন করত। এদের অধিকাংশই আগের মতোই পাথরের আর মাটির তৈরি দেব-দেবীর উপাসনা করা অব্যাহত রাখে। তারা ধারণা করত এই দেব-দেবীরা তাদেরকে সুখী করবে, সম্পদশালী করবে। অন্যদিকে, মক্কায় যেসব ধর্মগুরু ছিলেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ছিলেন তারাও ওইসব দেব-দেবীর মূর্তিপূজায় জনগণকে উৎসাহ প্রদান করত। মক্কার অধিকাংশ ধর্মগুরু এবং গোত্রপ্রধানরাই আল্লাহকে একমাত্র প্রভু এবং মুহাম্মাদকে (সা) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল।

রাসূলের (সা) সাহাবি এবং অনুসারীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য কিন্তু তাদের ঈমান ছিল মজবুত। মক্কার কিছু কিছু ব্যক্তি অবশ্য ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানের কার্যক্রম গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করত এবং তাদের নিয়ে আলোচনা করত। এই মানুষগুলো অনুভব করত যে, ইসলাম গ্রহণকারী মানুষগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মক্কার অধিবাসীদের কেউ কেউ মুহাম্মাদকে

(সা) সত্যনিষ্ঠ এবং সঠিক পথের অনুসারীও মনে করত এবং কখনো কখনো তারা দেব-দেবীর উপাসনা চর্চা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করারও আগ্রহ পোষণ করত।

কিন্তু মক্কার ধর্মগুরু আর গোত্রপ্রধানরা এই ধরনের আড্ডা ও আলোচনাকে কখনোই বরদাশত করত না। বরং এ ধরনের কথাবার্তা শুনলেই তারা রাগে ক্রুদ্ধ হয়ে যেত। তারা সাধারণ মানুষকে হুমকি দিয়ে বলত, "যদি তোমরা মুহাম্মাদের দাবি অনুযায়ী নতুন ধর্ম গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদের সব মালিকানা, সম্পদ এবং ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে।" মুখে যত কথাই বলুক না কেন, এসব স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এও বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল যে, মুহাম্মাদের নতুন ধর্মের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার একটাই উপায় আছে আর তা হলো তাকে হত্যা করা।

সেই চিন্তার আলোকে কাজ শুরু হয়ে গেল। মক্কার সব ধর্মগুরু এবং গোত্রপ্রধানরা মিলে গোপনে নবি মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করার জন্য একটি পরিকল্পনা করল। মক্কার প্রতিটি গোত্র থেকে তারা একজন করে বলিষ্ঠ এবং সাহসী সদস্য বাছাই করল এবং তাদের নিয়ে একটি দল গঠন করল। দলের প্রতিটি সদস্যের হাতে ধারালো অস্ত্র তুলে দিল। তারা সেই খুনী দলের সদস্যদের রাতের বেলায় নবি মুহাম্মাদের (সা) ঘরের চারপাশে চক্কর দেওয়ার আদেশ দিল এবং বলল ভোরে যখন মুহাম্মাদ (সা) ঘর থেকে বের হবে তখনই যেন তাকে হত্যা করা হয়। সেই সাথে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল যুবকদের চোখ-কান খোলা রাখতে বলল যাতে রাতের বেলায় কোনো ভাবেই মুহাম্মাদ (সা) পালিয়ে যেতে না পারেন। শুধু তাই নয়, নবি মুহাম্মাদ (সা) যাতে তার বাড়ির বাইরে যেতে না পারেন- এটা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে পালাক্রমে রাত জেগে পাহারা দিতেও বলা হলো।

কিন্তু নবি মুহাম্মাদ (সা) হলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল। শত্রুপক্ষের এতো সব চেষ্টার পরও আল্লাহ তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে হেফাজত করলেন এবং তার জীবন রক্ষা করলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরাইশ নেতাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে নবি মুহাম্মাদকে (সা)

আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মক্কা ছেড়ে যাওয়ার এবং তৎকালীন ইয়াসরিব তথা আজকের মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। যেখানে আগে থেকেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন। তারা অধীর আগ্রহে নবিজির (সা) জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আল্লাহ রাসূল (সা) কে এই হত্যা পরিকল্পনার বিষয়টি জানিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই নবি মুহাম্মাদ (সা) তার চাচাতো ভাই হযরত আলীকে (রা) ডেকে পাঠালেন।

হযরত আলী (রা) আসার পর তাকে রাসূল (সা) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রু পক্ষের লোকেরা এসে আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলবে। তাদের হাতে তরবারি থাকবে তবে তারা সকাল পর্যন্ত বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করবে কারণ তারা দিনের আলোতে আমাকে হত্যা করতে চায়। তাদের পরিকল্পনা আজ রাতে যখন আমি ঘুমাতে যাব তখন থেকে তারা আমাদের বাড়ির উপর নজর রাখবে। বিশেষ করে, আমার বিছানার উপর তারা নজর রাখবে। ওরা চলে আসার আগে, এই মুহূর্তেই যদি আমি বেরিয়ে যাই তাহলে তারা আমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু যদি তারা দেখে আমার বিছানাটা খালি পড়ে আছে তাহলে তারা বুঝে ফেলবে যে আমি আগেই বের হয়ে গিয়েছি।"

এটুকু বলে রাসূল (সা) হযরত আলীকে (রা) বললেন, "তুমি কি আমার বিছানায় আজ একটু ঘুমাতে পারবে? যদি তুমি তোমার মুখ ঢেকে রাখ তাহলে তারা তোমাকে দেখতে পাবে না। তারা মনে করবে যে আমি দিব্যি বাসায় ঘুমাচ্ছি। সকালবেলা যখন তারা সত্যটি জানতে পারবে ততক্ষণে আমি ইয়াসরিবের পথে অনেকটুকু এগিয়ে যাব।"

হযরত আলী (রা) রাসূলের (সা) পরিকল্পনায় পুরোপুরি সম্মত হলেন এবং আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি নবি মুহাম্মাদকে (সা) অনেক বেশি ভালোবাসতেন এবং যে কোনো উপায়ে রাসূলের উপকার করতে পারলেই হযরত আলীর (রা) অনেক বেশি

ভালো লাগতো। এভাবে দুই ভাই নিজেদের চিন্তায় ও কৌশলে একমত হওয়ার পর হযরত মুহাম্মাদ (সা) গোপনে তার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অর্থাৎ শত্রুরা তার বাসার উপর নজর রাখার আগেই তিনি তার বাসা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

রাসূল (সা) চলে যাওয়ার পর বাসায় হযরত আলী (রা) একাই রয়ে গেলেন। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চাদর দিয়ে নিজের মুখ ও শরীর ঢেকে ফেললেন। তিনি জানতেন ততক্ষণে শত্রুরা গোটা বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। কিন্তু তিনি একদমই ভয় পাননি বরং তিনি তার মতো করে ঘুমিয়ে গেলেন। সেই রাতে বরং হযরত আলীর (রা) ঘুম অনেক ভালো হলো। কিশোর সাহাবি হযরত আলী (রা) জানতেন তিনি যা করছেন তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি কাজটি করতে গিয়ে তার জীবনও চলে যেতে পারে। সকালবেলা শত্রুরা ঘরের ভিতরে এসে চাদর সরিয়ে যদি দেখে যে রাসূল (সা) নেই এবং তার বদলে আলী শুয়ে আছে তাহলে তারা প্রচণ্ড রাগে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যাও করে বসতে পারে। এগুলো জানা সত্ত্বেও হযরত আলীর (রা) মনে বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না কারণ তিনি আল্লাহকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পেতেন না।

হযরত আলী (রা) যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, শত্রুপক্ষের লোকেরা ততক্ষণে বাড়ি ঘেরাও করে তার চারপাশে পাহারা বসিয়ে ফেলেছিল। বাইরে থেকে ঘরের ভেতরের বিছানা দেখা যেত। বিছানার উপর কেউ একজন শুয়ে থাকায় শত্রুরা ধরেই নিয়েছিল যে নবি মুহাম্মাদ (সা) ঘরেই আছেন এবং বিছানায় ঘুমাচ্ছেন। তারপরও মক্কার উর্ধবতন নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা ভোর হওয়ার অপেক্ষা করছিল। ভোর হলেই তারা মুহাম্মাদের (সা) ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবে এবং তাকে হত্যা করবে।

ভোর হওয়ার পর তারা দ্রুত বেগে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল যেখানে তাদের জন্য গভীর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তারা দেখল, বিছানায় নবি মুহাম্মাদ (সা) নেই বরং কিশোর আলী (রা) সেখানে শুয়ে আছেন। তারা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল

না। সারাটা রাত তারা বাড়ির উপর নজর রেখেছিল। সেই নজর ফাঁকি দিয়ে মুহাম্মাদ (সা) কিভাবে বের হয়ে গেল এটা তারা বুঝতে পারছিলো না। তারা সারা ঘর তন্নতন্ন করে তল্লাশি করল কিন্তু কোথাও নবি মুহাম্মাদকে (সা) খুঁজে পেল না। নিজেদের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে তারা রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল।

আশপাশের বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে নবি মুহাম্মাদকে (সা) না পেয়ে তারা আবার রাসূলের ঘরে ফিরে এলো এবং হযরত আলীকে (রা) আটকে ফেলল। তারা চিৎকার করে আলীকে (রা) প্রশ্ন করল, "বল, কোথায় সে কথা লুকিয়ে আছে?"

হযরত আলী (রা) অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ইতোমধ্যেই মক্কা ত্যাগ করেছেন। তিনি আর এখানে নেই। তোমরা সারাদিন খুঁজলেও তাকে আর পাবে না।"

ক্রুদ্ধ কুরাইশ সদস্যরা হযরত আলীকে (রা) আবার প্রশ্ন করল, "তাহলে বল সে কোথায় গেছে? আমরা তার পিছনে তাড়া করব এবং তাকে ধরে ফেলবো। যদি তুমি সত্যটা না বল তোমাকে আমরা নির্মমভাবে প্রহার করব।"

তাদের এতো হুমকি ধামকি সত্ত্বেও হযরত আলী (রা) বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না। তিনি উত্তর দিলেন, "নবি মুহাম্মাদ (সা) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন আর এই মুহূর্তে আমি এর বেশি আর একটা কথাও তোমাদের বলব না।"

হযরত আলী (রা) কোনো ভাবেই আর কিছু না বলায় কুরাইশ সদস্যরা হতাশ হয়ে তাকে ফেলে চলে যায়। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পর রাসূল (সা) নিরাপদে ইয়াসরিবে পৌঁছে যান। পরবর্তীতে এই ইয়াসরিব শহরটির নাম করা হয় মদিনাতুন্নবী অর্থাৎ নবির শহর।

বেশ কিছুদিন পর হযরত আলী (রা) ইয়াসরিবে যান এবং নবি মুহাম্মাদের (সা) সাথে তার দেখা হয়। রাসূল (সা) প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করলেন, "যখন ইসলামের শত্রুরা তোমাকে আঘাত করার হুমকি দিল তখন কি তুমি ভয় পেয়েছিলে?"

হযরত আলী (রা) বয়সে কিশোর হলেও অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উত্তর দিলেন, "না, আমি ভয় পাইনি। আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় পাই না।"

একটি অসম লড়াই

রাসূল (সা) এর মদিনায় হিজরতের পর পাঁচটি বছর কেটে গেছে। এরই মধ্যে মক্কা থেকে কাফের সেনারা দুবার মদিনার মুসলমানদের আক্রমণ করেছিল যার ফলশ্রুতিতে বদর ও ওহুদের মতো দুটি বড় যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। খবর পাওয়া গেল, কুরাইশ সদস্যরা আবার বিরাট একটি সেনাবাহিনী নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবার ইসলামের শত্রুরা শুধু মক্কা থেকেই আসছে না বরং গোটা আরবের বিভিন্ন গোত্রের ও বিভিন্ন স্থানের ইসলাম বিরোধী লোকদের সমন্বয়ে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে মদিনা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে। আরো জানা গেল কাফের সেনাবাহিনীতে এবার চব্বিশ হাজার সেনা রয়েছে। বলাই বাহুল্য মুসলমানদের সংখ্যা সে তুলনায় ছিল যৎসামান্য। কিন্তু তারপরও মুসলমানরা এক মুহূর্তের জন্যেও ভয় পায়নি।

যদিও মুসলমানেরা সংখ্যায় কম ছিল, তাদের ঘোড়ার সংখ্যা কম ছিল, উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না; কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান এবং রাসূলের (সা) প্রতি ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তারা জানতেন, যদি এই যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা শহীদ হন তাহলে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দান করবেন।

যা হোক মক্কীসেনা, বনু কিনানা এবং তিহামা অঞ্চলের লোকদের সম্মিলিত বাহিনী যখন মদিনার কাছাকাছি এসে পৌঁছলো তখন তারা এমন একটি দৃশ্য দেখল যা দেখে তারা হতাশায় ডুবে গেল। তাদের সামনে রীতিমতো বিস্ময়কর একটি প্রতিবন্ধকতা এলো যা মোকাবেলা করার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। কাফের সেনারা দেখল গোটা মদিনার চারপাশে গভীর পরিখা খনন করা হয়েছে। মূলত

কাফেরদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে রাসূলের (সা) নির্দেশনা অনুযায়ী সাহাবিরা বিগত কয়েক দিন মাটি খুঁড়ে মদিনা শহরের চারপাশে এই পরিখা খনন করেছেন।

প্রাথমিকভাবে পরিখা দেখে কুরাইশরা থামতে চায়নি। তারা বীরদর্পে ঘোড়া ছুটিয়ে পরিখা অতিক্রম করে মদিনায় ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের ঘোড়াগুলো পরিখার সামনে গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে গেল। গভীর পরিখা দেখে ঘোড়াগুলো কোনো ভাবেই লাফ দিতে চাইছিল না। ঘোড়ার উপরে বসা কুরাইশ নেতারা চাবুক মেরে, ধমক দিয়েও ঘোড়াগুলোকে এক পাও নড়াতে পারছিল না।

কাফেররা মাঝে কিছুটা বিরতি দিয়ে আবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘোড়াগুলো কোনো ভাবেই তাদের কথা শুনছিল না। শেষমেষ তারা তাদের বিশাল বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে চৌকস এবং পারদর্শী অশ্বারোহী আমরের দ্বারস্থ হলো। কুরাইশ নেতা আমর লোহার তৈরি বর্ম এবং শক্তিশালী হেলমেট পরিধান করে তার ঘোড়ার উপর বসে ছিল। সবাই যখন ঘোড়া নিয়ে লাফ দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল, আমর তখন গোটা পরিস্থিতি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। সে তার নিজের মতো করে গোটা পরিখা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। তার চিন্তা ছিল যে জায়গায় পরিখা অগভীর এবং সরু সেই স্থান দিয়েই সে লাফ দিয়ে পার হয়ে যাবে।

সুযোগ সন্ধানী আমর খুঁজতে খুঁজতে ঠিকই একটি সরু স্থান বের করে ফেলল এবং সেখান দিয়ে লাফ দিয়ে তার ঘোড়াসহ পরিখার অপর প্রান্তে পৌঁছে গেল। মুসলমানরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করল। যদিও মুসলমানরা কিছুটা রক্ষণাত্মক কৌশলের অংশ হিসেবে নিজেদের রক্ষা করার জন্য এই পরিখা খনন করেছিল তারপরও যুদ্ধ করার মতো পূর্ণ প্রস্তুতি মুসলমানদের ছিল। যে স্থানটির উপর দিয়ে আমর লাফ দিয়েছিল, পরিখার ঐ জায়গাটি পাহারা দেয়ার দায়িত্ব ছিল মুসলিম বাহিনীর একটি ছোট দলের যার নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আলী (রা)। লাফ দিয়ে আমরের পরিখা পার হওয়ার সেই দৃশ্য হযরত আলীর (রা) চোখ এড়ালো না। এর আগে বদরের যুদ্ধেও

আমরকে হযরত আলী (রা) লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি জানতেন আমর তার শরীরে লোহার তৈরি বর্ম পরিধান করে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমর খুবই সাহসী, শক্তিশালী এবং চৌকস একজন যোদ্ধা।

পরিখা পার হয়ে এসেই হযরত আলীর (রা) নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে দেখে আমর ব্যক্তিগত মল্লযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলো। সে চিৎকার করে বলল, "তোমাদের মধ্যে কার সাহস আছে সে এগিয়ে আসতে পার। আমি তার সাথে সরাসরি মল্লযুদ্ধ করতে চাই।"

মুসলমানরা তার চ্যালেঞ্জ শুনে একে অপরের দিকে তাকালো। তারা নবিজির (সা) চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে তার অনুমতির অপেক্ষা করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত আলী (রা) মল্লযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সামনে দুপা এগিয়ে গেলেন। নবিজি (সা) তাকে থামালেন। স্নেহের আলী (রা) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই মল্লযুদ্ধে যাবে বিষয়টি ভেবে তিনি কিছুটা সময় নিচ্ছিলেন। হযরত আলীকে (রা) নবিজি (সা) বললেন, "আলী, তুমি কি দেখছো না, ওটা আমর। সে খুব সাহসী যোদ্ধা।"

এরকম পরিস্থিতিতে আমর আবারো গগণবিদারী চিৎকার দিয়ে উঠল। "এই মুসলমানেরা, তোমাদের মধ্যে কি আজ কোনো সাহসী ব্যক্তি নেই? আমার সাথে যুদ্ধে হেরে কেউ কি আজ বেহেশতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছ না?"

হযরত আলী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তার তরবারি বের করলেন। শেষ মুহূর্তে আবারো তিনি রাসূলের (সা) অনুমতির জন্য তার মুখপানে তাকালেন। কিন্তু এবারও রাসূল (সা) কিছু বললেন না। তৎকালীন আরবের সংস্কৃতি ছিল কেউ যদি তার প্রতিপক্ষকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানায় তাহলে তাকে উস্কানি দেওয়ার জন্য আক্রমণকারী ছন্দাকারে ব্যাঙ্গাত্মক কথাবার্তা বলে। আমরও ঠিক সেভাবেই হযরত আলীকে (রা) নিয়ে ঠাট্টা করছিল।

"আমি হলাম আমর; আমার বুক ভরা অহংকার
তাই আমি নীরব নই, করি গগনবিদারী চিৎকার
ও হে মুসলমানরা, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দাও

আমায় মুকাবেলা কর আর নিজের কবর খুঁড়ে নাও।"

এবার আর প্রিয় নবি (সা) আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন এই ধরনের উস্কানিমূলক আহ্বানের পর আলীকে (রা) আর ধরে রাখা সম্ভব হবে না। তিনি হযরত আলীকে (রা) মল্লযুদ্ধে যাওয়ার সম্মতি দিলেন। হযরত আলী (রা) তখন সাহসী এক তরুণ। তিনি তার তরবারি বের করে আমরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরের চ্যালেঞ্জের উত্তরে তিনিও ছন্দাকারে বলতে থাকলেন,

"আমার অন্তর জানে কতটা দৃঢ় আমার বিশ্বাস
সত্যই জয়ী হবে এটাই আমার রবের আশ্বাস
ও হে আমর, আমি তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম
আজ এখানেই হবে তোমার জীবনাবসান।"

হযরত আলীর (রা) মতো অল্প বয়সি একজন তরুণকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে বিশালাকৃতির আমর খুব বিস্মিত হলো। সে অট্টহাসি দিয়ে ফেটে পড়ল। তারপর সে হযরত আলীকে (রা) মায়া করতে শুরু করল। আর বলল, কি লজ্জা, তুমি তোমার এই বয়সে জীবন দিতে এগিয়ে এলে। বরং ভালো হয়, তুমি ফিরে যাও আর তোমার বাবা-চাচার বয়সি কাউকে পাঠিয়ে দাও।"

আলী (রা) তার খোঁচায় বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। বরং দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চাই। এবং আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমি তোমায় হত্যা করব।"

হযরত আলীর (রা) মতো একজন তরুণের এ ধরনের বেপরোয়া কথা শুনে আমর নিজের রাগকে আর ধরে রাখতে পারল না। সে তরবারি উঁচু করে ঘোড়া ছুটিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে গেল। আমর তার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে হযরত আলীর (রা) উপর আঘাত হানলো কিন্তু হযরত আলী (রা) নিজের বর্ম দিয়ে সেই আঘাত প্রতিহত করলেন।

এরপর তারা দুজনই নিজেদের তলোয়ার বের করে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলেন। কঠিন এক যুদ্ধের পর অবশেষে হযরত আলী (রা) বিজয়ী হলেন। আমর মাটিতে পড়ে গেল এবং হযরত আলী (রা) তার বুকের উপর আসীন হলেন। যখনই হযরত আলী (রা) তার উপর

চূড়ান্ত আঘাত হানতে যাবেন, তখনই আমর হযরত আলীর (রা) মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।

এমনিতেও আমরের কপালে মৃত্যু ছিল। তার উপর সে এভাবে হযরত আলীর (রা) মুখে থুথু মারায় আশপাশের সবাই নিশ্চিত হয়ে গেল যে এবার আর আমরের কোনো নিস্তার নেই। কিন্তু আশ্চর্য! লোকটিকে হত্যা না করে বরং হযরত আলী (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু না বলে হেঁটে একটু দূরে সরে গেলেন। যারা পাশ থেকে দাঁড়িয়ে ঘটনাবলি দেখছিল, তারা সবাই হযরত আলীর (রা) এই আচরণে খুবই অবাক হলো। তারা বুঝতে পারল না, কেন ইসলামের এমন একটি সাক্ষাৎ শত্রুকে হত্যা করার সহজ সুযোগ পেয়েও হযরত আলী (রা) তাকে এভাবে ছেড়ে দিলেন।

যাহোক, সুযোগ পেয়েই আমর আবার উঠে দাঁড়ালো এবং দ্বিগুণ বেগে হযরত আলীর (রা) উপর আক্রমণ চালালো। কিছুক্ষণ পর আবারও হযরত আলী (রা) তাকে পরাজিত করলেন এবং এবার তিনি এই কাফের সদস্যকে হত্যা করলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর লোকজন হযরত আলীকে (রা) প্রশ্ন করল, প্রথমবার বাগে পেয়েও কেন তিনি আমরকে হত্যা করেননি।

হযরত আলী (রা) উত্তর দিলেন, "আমি তাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে থুথু মারায় তার প্রতি আমার ভীষণ রাগ হলো। তখন যদি আমি তাকে হত্যা করতাম তাহলে তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হত্যা করা হতো না। বরং আমার রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও সেই হত্যাটি গণ্য হতো। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। এরপর যখন আমি আমার রাগটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলাম, তখন আমি তাকে হত্যা করলাম। কেননা তখন আমি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই কাজটি করতে পেরেছি।"

এই ছিল আমাদের পূর্বসুরী মুসলিম দায়িত্বশীলদের মানসিকতা। তারা নিয়তকে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন। আমাদেরও উচিত তাদের অনুসরণ করা। যখনই আমরা কোনো কাজ করব, তা যেন হয় শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই। এর পেছনে ভিন্ন কোনো

উদ্দেশ্য যেন না থাকে।

নিজেদের কাজকে বাজে ও দূষিত নিয়ত থেকে মুক্ত রাখা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আমরা যদি নিজেদের জীবনের গতিপথ নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করি, জীবনের লক্ষ্যের বিষয়ে সচেতন হই, তাহলে অবশ্যই আমরা নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখতে পারব। আমাদের সবসময় ভাবতে হবে কিভাবে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব? আল্লাহ আমাদের কাছে কি চান আর কিভাবে আমরা তা করতে পারব-এমনটাই আমাদের সবসময় চিন্তা করা প্রয়োজন।

যে আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে (সা) ভালোবাসে

খাইবার অঞ্চলটির অবস্থান মদিনা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরে। মদিনার ইহুদি গোত্রগুলো খাইবার অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করত। কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতগুলো যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, প্রতিবারই তাদেরকে খাইবার অঞ্চল পার হয়ে আসতে হতো। আহযাবের যুদ্ধের সময় যখন মক্কার কুরাইশসহ সকল গোত্র এবং গোটা আরবের ইসলামবিরোধী সমস্ত শক্তি এক হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসলো এবং আমর ও হযরত আলীর (রা) মধ্যে ঐতিহাসিক মল্লযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হলো। আহযাবের যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী গড়ার ব্যাপারে এই খাইবার অঞ্চলের ইহুদিরা মদিনার আশপাশের অন্যান্য গোত্রকেও প্ররোচিত করেছিল যাতে তারা সকলে মিলে মদিনার উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। মুসলমানরা সবসময় জানতো খাইবারকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে না পারলে মদিনার মুসলমানরা কখনোই সার্বিকভাবে নিরাপদ হতে পারবে না।

ষষ্ঠ হিজরিতে রাসূল (সা) মক্কাবাসীর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। এর পরপরই তিনি খাইবার জয় করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। খাইবার অঞ্চলে অনেকগুলো দুর্গ ছিল। রাসূলের (সা) নেতৃত্বে মুসলমানরা একের পর এক দুর্গ জয় করছিল। প্রথম যে দুর্গটি মুসলমানরা জয় করে তার নাম ছিল নাঈম। তারপরে আল কামুস

দুর্গের পতন ঘটে। এরপরে যে দুর্গটি জয় করার চেষ্টা করা হয় তার নাম আল সাব। সবশেষে যে দুটি দুর্গ জয় করা বাকি ছিল তার একটির নাম আল ওয়াতিহ আর অপরটির নাম আল সুলালিম।

এই দুর্গগুলো অবরোধ করে জয় করতে বেশ সময় লাগছিল। কারণ প্রতিটি দুর্গই ছিল মজবুত এবং এগুলোর সামরিক মজুদও ছিল অনেক বেশি। এর মধ্যে একটি দুর্গ অনেক দিন অবরোধ করে রাখার পরও তা জয় করা যাচ্ছিল না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এই দুর্গটি জয় করা রীতিমতো অসম্ভব। যতবারই দুর্গে আক্রমণ করা হচ্ছিল ততোবারই মুসলমানরা ইহুদিদের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণ মোকাবেলা করছিল। কোনোভাবেই মুসলমানরা দুর্গটি জয় করতে পারছিল না।

অবশেষে রাসূল (সা) সকল সাহাবিকে ডেকে পাঠালেন এবং ঘোষণা দিলেন, "আগামীকাল আমি ইসলামের পতাকা আমার এমন একজন সঙ্গীর হাতে দেব যে আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। তার হাত দিয়েই আমাদের কাঙ্খিত দুর্গটি জয় করা সম্ভব হবে।"

এই ঘোষণার পর গোটা দিন জুড়েই প্রত্যেক সাহাবি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন আল্লাহর রাসূল (সা) কার হাতে ইসলামের ঝান্ডা তুলে দেন। প্রত্যেকেই আশা করেছিলেন হয়তো তাকেই রাসূল (সা) এই গুরুদায়িত্ব প্রদানের জন্য বাছাই করবেন। সকাল হলো। রাসূল (সা) হযরত আলীকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "এই পতাকাটি নাও এবং সম্মুখপানে এগিয়ে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে।"

রাসূল (সা) যখন হযরত আলীকে (রা) দুর্গ জয়ের দায়িত্ব দিলেন তখন তার চোখে এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধি হয়েছিল। দায়িত্বটি পেয়ে হযরত আলী (রা) রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, যেখানে তিনি ভালোমতো দেখতেই পাচ্ছেন না সেখানে তিনি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই মিশনটি সফলতার সাথে শেষ করবেন।

যা হোক রাসূল (সা) নিজেই হযরত আলীর (রা) মাথায় পাগড়ী বেঁধে দিলেন এবং নিজ মুখের লালা থেকে হযরত আলীর (রা) চোখে মলমের মতো লাগিয়ে দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তারপরই হযরত আলীর (রা) চোখ ভালো হয়ে গেল এবং তিনি পরিষ্কারভাবে দেখতে পারছিলেন। হযরত আলী (রা) এই পর্যায়ে রাসূলকে (সা) প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখবো?"

নবিজি (সা) উত্তর দিলেন, "তুমি যখন দুর্গের কাছে পৌঁছাবে তখন সবার আগে তাদের কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠাবে। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানাবে এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। যদি আল্লাহর নামে তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিও সঠিক পথে চলে আসে তাহলে তার বিনিময়ে তুমি অনেক বেশি সওয়াব পাবে।"

রাসূলের (সা) নির্দেশনা মোতাবেক ছোট্ট একটি দল নিয়ে হযরত আলী (রা) দুর্গ অভিমুখে অভিযান শুরু করলেন। দুর্গের কাছে পৌঁছে তিনি পাথরের একটি স্তূপের উপর ইসলামী শক্তির নিদর্শন স্বরূপ পতাকা লাগালেন। ঠিক তখন দুর্গের উপর থেকে একজন ইহুদি চিৎকার করে তাকে প্রশ্ন করল, "তুমি কে?"

হযরত আলী (রা) উত্তর দিলেন,"আমি আলী, আবু তালিবের সন্তান, নবি মুহাম্মাদের (সা) চাচাতো ভাই।"

এই পরিচয় শোনা মাত্রই দুর্গের ভেতরে থাকা সকল সৈন্য একসাথে হযরত আলীর (রা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে এলো। এর মধ্যে একজন সৈন্য দ্রুত গতিতে এসে হযরত আলীকে (রা) তরবারি দিয়ে এতো জোরে আঘাত করল যে, হযরত আলীর (রা) হাত থেকে তার বর্মটি মাটিতে পড়ে গেল। তখন আল্লাহর রহমতে হযরত আলীর (রা) উপর এমন কুদরতি শক্তি ভর করল যে তিনি দুর্গের একটি দরজাকে খুলে সেটাকে উঁচু করতে সক্ষম হলেন এবং সেই দরজাকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করলেন। এতো বিশাল দরজাকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করায় তিনি সাহসিকতার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করে যেতে

পারলেন এবং এক পর্যায়ে আল্লাহ তাকে কাঙ্ক্ষিত বিজয় দান করলেন। মুশরিক সৈন্যদের পরাস্ত করার পর যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন হযরত আলী ক্লান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন।

এই সমরযাত্রায় আবু রাফি (রা) নামক একজন সাহাবি হযরত আলীর (রা) সঙ্গে ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দেন যে, এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী কোনো এক সময়ে তিনি তার সাতজন সঙ্গীসহ উক্ত দুর্গের দরজাটি উঠানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তারা দরজাটিকে উঁচু করা তো দূরের কথা, সামান্য নড়াতেও পারেননি। কিন্তু হযরত আলী (রা) সেদিন এসে যুদ্ধের সময় একাই সে দরজাটি শুধু নাড়াতে নয় বরং মাথার উপর তুলতে এবং দরজাটি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে লড়াই করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালার উপর হযরত আলীর (রা) আস্থা অনেক বেশি ছিল। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও সে কারণে তাকে এমন কুদরতি শক্তি দান করেছিলেন যা দিয়ে তিনি সেই অসাধ্য কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ■

আলী আহমাদ মাবরুর।

এক সময় সাংবাদিকতা করলেও এখন অনুবাদকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। ছাত্রজীবনে এই বিষয়ে গোল্ড মেডেলিস্ট হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। একটি জাতীয় দৈনিকের সাব-এডিটর হিসেবে পেশাগত জীবনের সূচনা। এরপর বেশ কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকে কাজ করে যোগ দেন দিগন্ত টেলিভিশনের ইংরেজি সংবাদ বিভাগে। সাংবাদিকতার পথ ধরে একসময় লেখালেখির জগতে প্রবেশ। অনুবাদ সাহিত্যে ইতোমধ্যে এই অনুবাদকের একটি আলাদা অবস্থান ও পরিচিতি তৈরি হয়েছে। প্রাঞ্জল সাবলীল লেখার হাত তাকে এনে দিয়েছে দারুন পাঠকপ্রিয়তা।

তার অনূদিত ডেসটিনি ডিজরাপটেড (ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস), মুসলিম চরিত্র, লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি (ইসলামের হারানো ইতিহাস)। খুররম জাহ্ মুরাদের 'আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত যারা' অনুবাদগ্রন্থ ছাড়াও আরো বেশ কিছু বই আসছে।